সালাতে বিনয়ী হওয়ার তেত্রিশ উপায়

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জেদ

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

ثلاثة ثلاثون سبباً للخشوع في الصلاة

« باللغة البنغالية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكر الله أبوالخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 – 1434

IslamHouse.com

সালাতে বিনয়াবন হওয়ার তেত্রিশ উপায়

ভূমিকা

খুশু প্রকাশ করা গুনাহ ও ঘৃণ্য।

এখলাসের আলামত হল, খুশুকে গোপন করা

খুশুর বিধান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস থেকে খুশুর ফযিলত এবং যারা খুশু অবলম্বন করা ছেড়ে দেয়, তাদের শাস্তি।

উল্লেখিত বিন্যাসের আলোকে আমরা সালাতে খুশু আনয়নের উপায়গুলো উল্লেখ করব।

প্রথমত: যে উপায়গুলো খুশুর কারণ হয় এবং খুশুকে শক্তিশালী করে, তার আলোচনা।

মাসআলা:

মাসআলা: মাসআলা: কোনো ব্যক্তির সালাতে বেশি ওয়াস-ওয়াসা পরিলক্ষিত হলে, তার সালাত সহীহ হবে নাকি তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

পরিশিষ্ট

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক এবং যিনি তার স্বীয় কিতাব-কুরআন করীমে- এরশাদ করে বলেন, ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨] "আর তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"।[1] তিনি সালাত সম্পর্কে আরও বলেন, ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥] "নিশ্চয় সালাত বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন"।[2] আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক মুত্তাকীদের ইমাম, বিনয়ীগণের সরদার আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবীদের উপর।

অতঃপর:

দ্বীনের কার্যগত রুকনসমূহের মধ্যে বড় রুকন হচ্ছে সালাত। আর সালাতে খুশু-খুযু তথা বিনয়াবনত থাকা ইসলামী শরীয়তের একটি মহান লক্ষ্য। আল্লাহর দুশমন ইবলিস আদম সন্তানকে গোমরাহ করা ও তাদের ফিতনায় জড়ানোর বিষয়ে এ বলে,

﴿ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ١٧﴾ [الاعراف: ١٧]

---

[1] সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮।

[2] সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

“তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না”।[1]- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কারণে, তার সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র হল, বিভিন্নভাবে মানুষকে সালাত হতে বিরত রাখা। কুমন্ত্রণার মাধ্যমে বান্দা যাতে সালাত আদায়ে কোন প্রকার তৃপ্তি ও মজা না পায় সে প্রচেষ্টা চালানো, সালাত আদায়ের সাওয়াব ও বিনিময় নষ্ট করা। আর যেহেতু সালাতে খুশু-খুযু এমন একটি বস্তু যা সর্ব প্রথম উঠিয়ে নেওয়া হবে, আর আমরা শেষ জামানার মানুষ, সেহেতু আমাদের বিষয়ে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র ভবিষ্যতবাণী পুরোপুরি প্রযোজ্য। তিনি বলেন,

أول ما تفقدون من دينكم الخشوع ، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورُبّ مصلٍّ لا خير فيه ، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا.

“তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়সমূহ হতে সর্বপ্রথম খুশুকে হারাবে, আর সর্বশেষ হারাবে সালাত। অনেক সালাত আদায়কারী আছে, তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। অচিরেই তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে, কিন্তু কোনো বিনয়াবনত সালাত

---

[1] সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭।

আদায়কারী দেখতে পাবে না।[1] সালাতে কুমন্ত্রণা ও খুশু না থাকার বিষয়টি মানুষ নিজেই অনুভব করে এবং অনেক অভিযোগকারী থেকে বিষয়টি শোনা যাওয়াতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন সুস্পষ্ট। তাই নিম্নের আলোচনাটি আমার নিজের জন্য ও মুসলিম ভাইদের জন্য উপদেশ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন এ লেখা দ্বারা আমাদের উপকার করেন।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون : ١، ٢]

ঐ সকল মুমিনরা সফল যারা তাদের সালাতে বিনয়াবনত।[2] অর্থাৎ যারা তাদের সালাতে ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রশান্ত। আর সালাতে 'খুশু খুযু'র অর্থই হচ্ছে, প্রশান্ত থাকা, সুস্থির থাকা, ধীরতা অবলম্বন, বিনম্র ও গাম্ভীর্যতা অবলম্বন। আর আল্লাহর ভয় ও তাঁর যথাযথ আল্লাহ সচেতনতা বান্দাকে খুশু অবলম্বন করতে উৎসাহ

---

[1] মাদারেজ আস-সালেকীন, ১/৫২১।

[2] সূরা আল মুমিনুন, আয়াত: ১, ২।

দেয় এবং সাহায্য করে।[1] আর খুশুর প্রকৃত রূপ হচ্ছে, মহান রব্বের সামনে হীন ও বিনয়ের সাথে অন্তরকে দাঁড় করানো[2]।

মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨] "তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"।[3] এর মধ্যে কুনুত অর্থ, আল্লাহর ভয়ে রুকু', বিনম্র হওয়া, চক্ষুকে অবনত করা, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংকোচিত করা[4]।

একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, খুশুর স্থান হল হৃদয়, আর খুশুর ফলাফল প্রকাশের স্থান হচ্ছে দেহ।

বস্তুত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং অলসতা বা শয়তানের কু-মন্ত্রণার কারণে যখন অন্তরের মধ্যে খুশু না থাকে, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইবাদত বা গোলামী বিনষ্ট হয়ে যায়। মানুষের আত্মা হল, রাজা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সৈন্য-সামন্ত; যেগুলো রাজার কথাই শোনে এবং তার নির্দেশই বাস্তবায়ন করে। মন বা হৃদয় তার মালিকের ইবাদত হারানোর মাধ্যমে যখন রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং সে বেকার হয়ে

---

[1] তাফসীরে ইবন কাসীর ৬/৪১৪।

[2] মাদারেজুস সালেকীন ১/৫২০।

[3] সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

[4] তা'যীমু কাদরিস সালাত ১/১৮৮।

যায়, তখন তার প্রজারাও ধ্বংস হয়ে যায়। আর সে প্রজাসাধারণ হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ।

তবে এটা জানা আবশ্যক যে, খুশু বা বিনয়াবণত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার বিষয় নয়, বরং যারাই এটাকে প্রকাশ করতে চাইবে তারাই রোষানলে পতিত হবে। আর তাই বান্দার আমলের মধ্যে ইখলাস তথা নিষ্ঠার দাবী হচ্ছে, খুশু বা বিনয়াবনত ভাবটিকে সে গোপন করে রাখবে।

সালাতে খুশুর বিধান

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' বলতেন,

إياكم وخشوع النفاق فقيل له : وما خشوع النفاق قال : أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع.

"তোমরা মুনাফেকি খুশু' হতে বেঁচে থাক। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, মুনাফেকি খুশু' কি? বলল, তুমি দেহকে বিনয়াবনত দেখাবে, অথচ মন বিনয়াবনত নয়"।

আর ফুদাইল ইবন আয়াদ্ব রহ. বলেন,

كان يُكره أن يُري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.

"কোনো মানুষ তার অন্তরে যতটুকু খুশু আছে, বাহ্যিক-ভাবে তার চেয়ে অধিক প্রকাশ করাকে অপছন্দ করা হতো।

ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال : يافلان ، الخشوع هاهنا وأشار إلى صدره ، لا هاهنا وأشار إلى منكبيه.

পূর্বসূরীদের কেউ কোনো এক লোককে দেহ ও বক্ষকে খুব ঝুকানো অবস্থায় দেখে বললেন, হে অমুক! খুশু এখানে, তারপর তিনি তার অন্তরের দিক ইঙ্গিত করলেন। ওখানে নয়, এরপর তিনি দু' কাঁধের দিকে ইঙ্গিত করলেন।[1]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. ঈমানী খুশু ও মুনাফেকী খুশুর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ঈমানী খুশু হল, সম্মান, বড়ত্ব, মহত্ত্ব, ভয় ও লজ্জা করার মাধ্যমে হৃদয় আল্লাহর জন্য বিনয়ী হওয়া। ফলে ভয়, অপমানবোধ, ভালোবাসা, লজ্জা, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করা এবং তার পক্ষ থেকে আল্লাহর নাফরমানীর অনুভূতিতে বান্দার অন্তর পরিপূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। আর যখন বান্দার মধ্যে এ ধরনের অবস্থা তৈরি হয়, তখন বান্দার অন্তর বিনয়াবনত হয়, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অন্তরের সাথে সাথে বিনয়াবনত হয়। পক্ষান্তরে মুনাফেকী খুশু হল, কৃত্রিম ও লোক দেখানো খুশু, যা শুধুমাত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই প্রকাশ পায়, অন্তর সম্পূর্ণ খালি। কোনো কোনো সাহাবী এ বলে দো'আ করতেন, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট নেফাকী খুশু থেকে

---

[1] মাদারেজুস সালেকীন ১/৫২১।

আশ্রয় চাই। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নেফাকী খুশু কি? বলল, ‘দেহ বিনয়ী দেখবে, কিন্তু অন্তর বিনয়ী নয়।’ সুতরাং আল্লাহর জন্য বিনয়ী এমন বান্দাকেই বলা যায়, যার কুপ্রবৃত্তির অনল নির্বাপিত হয়েছে এবং যার অন্তর থেকে সে কুপ্রবৃত্তির ধোঁয়া নিঃসরণও বন্ধ হয়েছে। ফলে তার বক্ষ আলোকিত হয়েছে এবং সেখানে আল্লাহর বড়ত্বের নূর উদ্ভাসিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ভয় ও মহত্বের আতঙ্কে তার অন্তরের কু-প্রবৃত্তিসমূহ মরে গেছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তেজ লোপ পেয়েছে, তার হৃদয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত প্রশান্তির মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর যিকিরের দিকে ধাবিত হয়ে সম্মানিত ও সন্তুষ্টচিত্ত হতে পেরেছে। এভাবেই সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিজের মনকে ‘মুখবিত’ বা সুস্থির করে নিয়েছে। বস্তুত: যমীনের মধ্যে সেটাকেই ‘মুখবিত’ বলা হয় যা স্থির ও সমান, আর তাতে পানি জমা হতে পারে। অনুরূপভাবে সে অন্তরই ‘মুখবিত’ যা বিনয়াবনত ও সন্তুষ্টচিত্ত। যেমন কোনো নিম্ন ও সমতলভূমির দিকে, যেদিকে পানি গড়ায় এবং তাতে অবস্থান করে। আর অন্তর বিনয়াবনত ও শান্ত হওয়ার চিহ্ন বা আলামত হচ্ছে, আল্লাহ বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে আল্লাহর সামনে নিজেকে অপমান-অপদস্ত ও ছোট মনে করে, এমনভাবে সেজদা করা, যেন সে সেজদার পরই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। আর এটাই হচ্ছে, ঈমানী খুশু। পক্ষান্তরে অহংকারী হৃদয়, সে তো তার অহংকারে লম্ফ-ঝম্ফ দিতে থাকে এবং বাড়তে থাকে,

ফলে সে অন্তর যমীনের উঁচু অংশের মত, তার উপর পানি অবস্থান করে না। অন্যদিকে মৃত্যুর ভান করা ও নেফাকী খুশু হচ্ছে এমন অবস্থার নাম, যা কৃত্রিমতা অবলম্বনের মাধ্যমে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। বস্তুত তার অন্তর কু-প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন রকম চাহিদা দ্বারা তরতাজা ও যুবক। সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুশু অবলম্বনকারী হলেও গোপনে সে তার শরীরে ধারণ করে থাকে এমন সব মাঠের বিচ্ছু ও বনের হিংস্র জন্তু, যেগুলো সব সময় শিকারের অপেক্ষায় থাকে।[1]

সালাতে খুশু তখন হাসিল হয়, যখন তার অন্তর সালাতের জন্য অবসর হয়। অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল সালাত নিয়েই ব্যস্ত হয় এবং সব কিছুর উপর কেবল সালাতকেই প্রাধান্য দেয়। তখন সালাত তার জন্য প্রশান্তি হয় এবং সালাত তার চোখের শীতলতা আনয়নকারী হয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার চোখের প্রশান্তি দেওয়া হয়েছে সালাতের মধ্যে।"[2]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উত্তম বান্দাদের গুণাগুণ বর্ণনায় সালাতে খুশু অবলম্বনকারী পুরুষ ও নারীদেরকে উল্লেখ করেছেন এবং

---

[1] কিতাবুর রূহ, পৃ: ৩১৪, দারুল ফিকির, জর্দান।

[2] তাফসীরে ইবন কাসীর ৫/৪৫৬; মুসনাদে আহমদ ৩/১২৮; সহীহুল জামে' ৩১২৪।

তিনি জানিয়ে দেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা বিনিময় ও প্রতিদান।[1]

খুশুর উপকারিতা হল, খুশু বান্দার সালাতকে সহজ করে দেয়। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও। নিশ্চয় সালাত বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন”।[2] অর্থাৎ সালাতের কষ্ট অনেক ভারী, তবে যারা খুশু অবলম্বন করে, তাদের জন্য তা কষ্টকর কিংবা কঠিন নয়।[3]

সালাতে খুশু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা খুব দ্রুত হারিয়ে যায় এবং যার অস্তিত্ব অত্যন্ত দুর্লভ। বিশেষ করে, আমাদের এ শেষ যুগ তথা আখেরি যামানায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا.»

---

[1] সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫।

[2] সূরা, বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

[3] তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/১২৫।

"এ উম্মত থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিষটি তুলে নেয়া হবে, তা হল সালাতের খুশু বা বিনয়াবনত হওয়া। ফলে তুমি কাউকে সালাতে বিনয়াবনত দেখতে পাবে না"।[1]

উত্তম পূর্বসূরীদের কেউ বলেন, সালাত হল, ঐ দাসীর মত, যা কোন বাদশাহদের বাদশাহকে হাদিয়া দেয়া হয়। সুতরাং তার প্রতি তোমাদের কি ধারণা হতে পারে, যে ব্যক্তি কোনো বাদশাহকে এমন একটি দাসী হাদিয়া দিল, যে কিনা অন্ধ, বধির, প্রতিবন্ধী, হাত পা কাটা, রোগা, কুৎসা ও দুর্গন্ধময়, এমনকি এমন একটি দাসী হাদিয়া দিল, যেটি মৃত, যার কোনো প্রাণ নেই? সুতরাং তোমার কেমন হবে সে সালাতের বিষয়টি যা কোনো বান্দা হাদিয়া দিল, আর সে তা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইল? অথচ আল্লাহ পবিত্র-উত্তম, যা পবিত্র-উত্তম শুধু সে বস্তু ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল করেন না। আর যে সালাতে রূহ নেই তা কখনো পবিত্র-উত্তম আমল নয়। যেমন, কোনো মৃত গোলাম

---

[1] আল্লামা হাইসামী স্বীয় রহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে ২/১৩৬ বলেন: আল্লামা তাবরানী তার মু'জামুল কাবীরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর হাদিসটির সনদ হাসান। হাদিসটি 'সহীহুত তারগীব কিতাবেও বর্ণিত, হাদিস নং ৫৪৩ এবং তার লেখক শাইখ আলবানী বলেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

যার কোনো রূহ নেই, তাকে স্বাধীন করা কোনো পবিত্র বস্তুকে স্বাধীন করা বুঝায় না।[1]

সালাতে খুশুর হুকুম:-

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যে, সালাতে খুশু অবলম্বন করা ওয়াজিব। শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও। নিশ্চয় সালাত বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন”।[2] আল্লাহ তা‘আলার এ কথা দ্বারা যারা সালাতে খুশু অবলম্বন করে না তাদের নিন্দা করা প্রতীয়মান হয়। ... আর কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া কিংবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণেই নিন্দা হয়ে থাকে। যারা সালাতে খুশু অবলম্বন করে না তারা নিন্দিত হওয়া সালাতে খুশু ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে। সালাতে খুশু ওয়াজিব হওয়া আল্লাহ তা‘আলা আরেকটি বাণী দ্বারাও প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

---

[1] দেখুন, মাদারেজ: ১/৫২৬।

[2] সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون : ١، ١١]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বিমুখ। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজদের লজ্জা স্থানের হিফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অত:পর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাজত করে। তারাই হবে, ওয়ারিশ। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে"।[1]

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, কেবল তারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবেন। এর অর্থ হচ্ছে,

[1] সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১, ১১।

যারা সালাতে বিনয়াবনত তারা ব্যতীত অন্যরা সেটার উত্তরাধিকার হতে পারবে না। আর যখন প্রমাণিত হলো যে, সালাতে খুশু‘ বা বিনয়াবনত হওয়া ওয়াজিব; আর সেটার সাথে থাকে সুস্থিরতা ও নত (কিংবা আনুগত্য) হওয়া, তাহলে যে ব্যক্তি কাকের ঠোকরের মত সালাত আদায় করে, সে তার সেজদায় খুশু অবলম্বন করে নি। অনুরূপভাবে যে রুকু থেকে মাথা উঠালো না এবং মাথা ঝুঁকানোর পূর্বে সুস্থিরভাবে দাড়ালো না, সে সালাতে শান্ত ভাব আনয়ন করতে পারল না। কারণ, সুস্থির থাকাই হচ্ছে প্রশান্ত থাকা। আর যে ব্যক্তি সালাতে সুস্থির অবলম্বন করে না, সে প্রশান্তি অবলম্বন করল না। আর যে প্রশান্তি অবলম্বন করল না, সে সালাত তথা- রুকু ও সেজদাতে খুশু অবলম্বন করল না। আর যে বিনয়াবনত অবলম্বন করল না, সে অপরাধী সাব্যস্ত হল। সালাতে বিনয়াবনত থাকা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আরেকটি প্রমাণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা সালাতে খুশু অবলম্বন করে না তাদের ধমকি দিয়েছেন। যেমন, সালাতের মধ্যে আকাশের দিক দেখা লোকটিকে ধমক দেন। কারণ, এটার অর্থই হচ্ছে, নড়া-চড়া করা, উপরের দিক মাথা উঠানো ইত্যাদি সালাতে খুশু অবলম্বন করার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[1]

[1] মাজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৫৫৩-৫৫৮

সালাতে খুশুর ফজিলত ও খুশু ছেড়ে দেয়া সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه»

“আল্লাহ তা‘আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওজু করে, ওয়াক্ত মত সালাতগুলো আদায় করে এবং ভালোভাবে রুকু-সেজদা করে ও খুশুকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এগুলো করে না, তাকে ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি চান ক্ষমা করবেন অথবা তাকে আযাব-শাস্তি- দেবেন।[1]

সালাতে খুশু অবলম্বন করার ফযিলত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه» [وفي رواية]: «لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه» [وفي رواية] «إلا وجبت له الجنة »

[1] আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৫, সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৩২৪২।

যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওজু করে, তারপর আল্লাহর দিক মনোযোগী হয়ে আন্তরিকতার সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, অপর বর্ণনায়, দুই রাকাত সালাত আদায় করতে তার অন্তর অন্য কোন চিন্তা করেনি, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। অপর এক বর্ণনায়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[1]

সালাতে খুশুর কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে, আমরা দেখতে পাই, খুশুর কারণসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত: যেসব কর্মগুলো করলে সালাতে খুশু পাওয়া বা অর্জন করা যায় এবং খুশুকে শক্তিশালী করে সেগুলো অবলম্বন করা। দ্বিতীয়ত: যেসব কর্মগুলো খুশুর প্রতিবন্ধক হয় বা খুশুকে দুর্বল করে দেয় সেগুলোকে প্রতিহত করা। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. খুশু বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, সালাতে খুশু বিষয়ে দুটি জিনিষ সাহায্য করে।

এক. খুশুর উপায়গুলো শক্তিশালী হওয়া, আর

দুই. খুশু প্রতিবন্ধকসমূহ দুর্বল হওয়া।

---

[1] বুখারি, হাদিস: ১৫৮, নাসায়ী ৯৫/১, সহীহুল জামে': ৬১৬৬।

প্রথম প্রকার: খুশুর দাবিসমূহ শক্তিশালী করা

বান্দা সালাতে যা বলে, যে সব কর্ম করে তা বুঝতে চেষ্টা করা, কুরআনের আয়াতসমূহ, যিকির, দো‘আ ইত্যাদিতে চিন্তা-ফিকির করা। আর মনে মনে এ কথা বলা, সে এখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে, আল্লাহর সাথে কথা বলছে, আল্লাহ তাকে দেখছে। কারণ, মুসল্লি যখন সালাতে দাড়ায় তখন সে আল্লাহর সামনে দাড়ায় এবং আল্লাহর সাথেই কথা বলে, আর কারো সাথে নয়।

আর ইহসান: « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » “তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ, আর যদি তুমি তাকে না দেখ, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন”। অতঃপর, যখন বান্দা সালাতের মজা ও স্বাদ গ্রহণ করবে, তখন সালাতের দিক তার ঝোঁক আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। আর এটি ঈমানের শক্তি অনুযায়ী হয়ে থাকে।

আর ঈমানকে শক্তিশালী করে এমন উপকরণ অসংখ্য। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

« حبب إليَّ من دنياكم : النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة »

“তোমাদের দুনিয়ার কয়েকটি জিনিষ আমার নিকট প্রিয় করা হয়েছে: নারী ও খুশবু। আর সালাতকে আমার চক্ষুশীতলকারী করা হয়েছে”। অপর হাদিসে বর্ণিত তিনি বলেন,

«أرحنا بالصلاة يا بلال»

“হে বিলাল, সালাতের মাধ্যমে আমাকে শান্তি দাও”। তিনি এ কথা বলেন নি সালাত হতে আমাকে মুক্তি দাও।

দ্বিতীয়ত: প্রতিবন্ধকতা দূর করা:

মানুষের অন্তর অনর্থক কাজে চিন্তা করার কারণে সালাত থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়, তাই তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করা। যে সব উপকরণ সালাতের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা। আর এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, যতবেশি সন্দেহ ও কু-প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দানা বাঁধে সে ততবেশি ওয়াস-ওয়াসা তথা দ্বিধা-দ্বন্দে ভুগতে থাকে। আর অন্তর যখন কোনো বস্তুকে মহব্বত করে তখন তা পাওয়ার জন্য সে ঘুরে বেড়ায়, অনুরূপভাবে যখন সে কোন কিছুকে অপছন্দ করে, তখন তা প্রতিহত করতে সে সর্বদা চেষ্টা চালায়।[1]

---

[1] মাজমু‘ ফাতাওয়া: ৬০৬-৬০৭।

উল্লেখিত শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী নিম্নে আমরা সালাতে খুশুর কিছু উপকরণ উল্লেখ করব:

প্রথমত: যে সব উপকরণগুলো অবলম্বন করলে সালাতের মধ্যে খুশু-খুযু টেনে আনে এবং শক্তিশালী করে সেগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

এ ধরনের উপকরণ অনেক রয়েছে, যেমন:-

(১) সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও তৈরি থাকা:

সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুতি কয়েক ভাবে হতে পারে-

- মুয়াজ্জিনের সাথে আযানের শব্দগুলো বলা।
- আযানের পর দো‘আ পড়া-

اللّٰهُمَّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته"

“হে আল্লাহ্, এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের আপনিই রব। আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন সর্ব উত্তম মাধ্যম ও মহান মর্যাদা। আর আপনি তাকে পৌছান ঐ প্রশংসিত স্থানে যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাকে দিয়েছেন।

- আযান ও ইকামতের মাঝে দো‘আ করা।

- সুন্দর করে ওজু করা।
- ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।
- ওজুর পরে দো‘আ এ দো‘আ পড়া-

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (اللَّهُمَّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন”।

- মিসওয়াকের ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা, আর তা হচ্ছে, মুখকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, যা দ্বারা একটু পরে সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা হবে। কারণ, হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«طهروا أفواهكم للقرآن»

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মুখকে কুরআনের জন্য পরিষ্কার কর।[1]

- সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ ۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الاعراف: ٣١]

"হে আদম সন্তান, তোমরা তোমাদের সৌন্দর্যকে প্রত্যেক সালাতের সময় গ্রহণ কর"।[2] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়ানোর সময় সৌন্দর্য অবলম্বন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর, পরিষ্কার ও সুঘ্রাণ যুক্ত কাপড় পরিধান করার কারণে মানুষের অন্তরে খুশির উদ্রেক হয়। যা ঘুমের পোষাক বা কাজের পোষাক দ্বারা অর্জিত হয় না।

- অনুরূপভাবে সতর ডাকার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া।
- সালাতের স্থানের পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

---

[1] বাযযার রহ.। তিনি বলেন, আলী রা. হতে এ সনদের থেকে উত্তম আর কোন বর্ণনা আমি জানি না। দেখুন: কাশফুল আসতার। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, পৃ: ২/৯৯, আল্লামা আলবানী রহ. বলেন, হাদিসটির সনদ উত্তম, দেখুন: আল-আহাদিসুস সাহীহা: পৃ: ১২১৩।

[2] সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৩১।

- আগে আগে সালাতে উপস্থিত হওয়া।
- সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকা।
- সালাতের কাতার সোজা করা, মাঝখানে কোনো ফাঁক না থাকা, কারণ কাতারের মধ্যস্থ ফাঁকগুলোতে শয়তান ঢুকে পড়ে।

২- সালাতে স্থিরতা অবলম্বন:

হাদিসে বর্ণিত,

(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থিরতা অবলম্বন করতেন, এমনকি তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব-স্থানে ফিরে যেত।[1] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারী সাহাবীকে এ বিষয়ে অর্থাৎ সালাতে স্থির থাকতে আদেশ দেন। তিনি তাকে বলেন,

«لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك»

---

[1] আল্লামা আলবানী রহ. সালাতের প্রদ্ধতি কিতাবে হাদিসটির সনদকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। পৃ: ১৩৪। আল্লামা ইবনে খুযাইমাহ রহ এর নিকটও হাদিসটি বিশুদ্ধ। যেমনটি উল্লেখ করেন, হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফতহুল বারীতে। দেখুন, পৃ: ২/৩০৮।

“তোমাদের কারো সালাত বিশুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে এ কাজগুলো না করবে”।[1]

আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قال يا رسول الله : كيف يسرق صلاته » قال : «لا يتم ركوعها ولا سجودها»

“সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর, যে সালাতে চুরি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাতে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, রুকু-সেজদাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না”।[2]

আবু আব্দুল্লাহ আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مثل الذي لا يتمّ ركوعه ، وينقر في سجوده ، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين ، لا يغنيان عنه شيئا»

“যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে রুকু করে না এবং সেজদায় ঠোকর দেয়, তার দৃষ্টান্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে শুধু একটি বা দুটি খেজুর খায় যা তার কোনো কাজে আসে না”।[1]

---

[1] আবু দাউদ, হাদিস নং ৫৩৬, ৮৫৮।

[2] আহমদ ও হাকেম, হাদিস: ১/২৯ এবং সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৯৯৭।

যে কেউ সালাতে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করবে না, তার দ্বারা খুশু সম্ভব নয়। কারণ, সালাতে তাড়া-হুড়া করা, সালাতের খুশুকে নষ্ট করে। আর কাকের মত ঠোকর দেয়া সালাতের সাওয়াবকে নষ্ট করে।

(৩) সালাতের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اذكر الموت في صلاتك ، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحريّ أن يحسن صلاته ، وصلّ صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها»

"তুমি তোমার সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ কর, কারণ, যখন কোনো ব্যক্তি সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করে, তখন সে তার সালাতকে সুন্দরভাবে আদায় করে এবং সে ঐ ব্যক্তির মত সালাত আদায় করে, যে ধারণা করে যে, এটি তার জীবনের শেষ সালাত, আর কোন সালাত আদায়ের সুযোগ সে পাবে না"।[2]

---

[1] কবীর গ্রন্থে আল্লামা তাবরানী ৪/১১৫, সহীহুল জামে'তে হাদিসটিকে হাসান বলা হয়েছে।

[2] আল্লামা আলবানীর সিলসিলাতুস সাহীহা, হাদিস: ১৪২১। আল্লামা সুয়ুতী বলেন, হাফেজ ইবনে হাজার হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস বর্ণিত, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেন,

«إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودِّع»

“যখন তুমি সালাত আদায়ে দাঁড়াবে, তখন তুমি বিদায়ী সালাত তথা তোমার জীবনের শেষ সালাত যেভাবে আদায় করতে সেভাবে সালাত আদায় কর”।[1] অর্থাৎ এমন লোকের সালাতের ন্যায় যে মনে করছে যে সে আর কোনো সালাত আদায় করার সুযোগ পাবে না। আর যদি মুসল্লিকে মরতেই হবে, তাহলে কোনো সালাত তো তার জন্য শেষ সালাত হবেই, সুতরাং তার উচিত হবে যে সালাতে সে আছে সেটাতে খুশু‘ অবলম্বন করা, কেননা, সে জানে না হতে পারে এটাই তার জন্য সেই শেষ সালাতটি।

(৪) সালাতে তিলাওয়াত কৃত আয়াত ও দো‘আসমূহের অর্থের মধ্যে চিন্তা করা এবং তাতে প্রভাবিত হওয়া:

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন চিন্তা-গবেষণার করার জন্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[1] আহমদ, হাদিস: ৫/৪১২। সহীহুল জামে‘তে হাদিস নং ৭৪২।

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩﴾ [ص: ٢٩]

"আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে"।[1]

আর চিন্তা করা তখন সম্ভব হবে, যখন কুরআন থেকে যা তিলাওয়াত করছে তার অর্থ জানা থাকবে। তখন সে কুরআনে অর্থের মধ্যে চিন্তা করবে, তার চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হবে এবং সে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ٧٣﴾ [الفرقان: ٧٣]

"আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না"।[2] এতে কুরআনের ব্যাখ্যা জানার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। আল্লামা ইবনে জারির রহ. বলেন, "যে কুরআন পড়ে অথচ কুরআনের ব্যাখ্যা জানে না, তার বিষয়ে আমি অবাক হই, সে কিভাবে কুরআন তিলাওয়াতে মজা পায়।"[3] সুতরাং,

---

[1] সূরা সাদ, আয়াত: ২৯।

[2] সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৩।

[3] মুকাদ্দামাতু শাইখ মাহমূদ শাকের লি তাফসীর তাবারী, ১/১০।

একজন তিলাওয়াতকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সে তিলাওয়াতের সাথে সাথে কুরআনের তাফসীর জানার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবে। যদি বিস্তারিত সম্ভব না হয়, কম পক্ষে সংক্ষিপ্ত তাফসীরের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করবে। যেমন, আল্লামা শাওকানী রহ. এর তাফসীর থেকে গৃহীত আল-আশকারের যুবদাতুত তাফসীর, আল্লামা সা'দীর 'তাইসিরুল করীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান'। তাও যদি সম্ভব না হয়, কুরআনে কঠিন শব্দ বিষয়ে আল্লামা আব্দুল আজিজ আস-সাইরওয়ান কিতাব যেমন, 'আল মু'জামুল জামে' লি গরীবি মুফরাদাতিল কুরআন'। কারণ, তিনি এ কিতাবে, কুরআনের অপরিচিত শব্দ বিষয়ে রচিত চারটি কিতাবকে একত্র করেছেন।

আর কুরআনের আয়াতসমূহে চিন্তা করার বিষয়ে যে জিনিষটি বেশি উপকারী তা হল, কুরআনের একটি আয়াতকে বার বার তিলাওয়াত করা। এটি ফিকির করতে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অধিক সহায়তা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন। হাদিসে বর্ণিত যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো রাত এক আয়াতকে বার বার তিলাওয়াত করতে থাকেন।[1] আয়াতটি ছিল,

---

[1] ইবনু খুযাইমা ১/২৭১, আহমদ ৫/১৪৯। শাইখুল আলবানীর সিফাতুস সালাত, পৃ: ১০২।

﴿إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١١٨﴾ [المائدة: ١١٨]

"যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তুমি নিশ্চয় মহাপরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়"।[1]

অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াতে চিন্তা করার উপর যে জিনিষটি সহায়ক হয়, তা হল, আয়াত পড়ার সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করা। যেমন, হাদিসে বর্ণিত, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' বলেন,

صليت مع رسول الله ذات ليلة.. يقرأ مسترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح و إذا مر بسؤال سأل و إذا مر بتعوذ تعوذ

"এক রাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করি, তিনি সালাতে খুব থেমে থেমে পড়ছিল, যখন কোন তাসবীহ বিশিষ্ট আয়াতের তিলাওয়াত করতেন, তখন তাসবীহ পড়তেন, কোন চাওয়ার আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন আল্লাহর নিকট চাইতেন এবং আশ্রয়ের আয়াত তিলাওয়াত করলে, আশ্রয় চাইতেন"।[2] অপর এক বর্ণনায়, তিনি বলেন,

---

[1] সূরা মায়েদা, আয়াত: ১১৮।

[2] মুসলিম, হাদিস: ৭৭২।

صليت مع رسول الله ليلة ، فكان إذا مر بآية رحمة سأل ، و إذا مر بآية عذاب تعوذ ، و إذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح.

“এক রাত আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করি, যখন কোনো রহমতের আয়াত পড়তেন, আল্লাহর কাছে রহমত চাইতেন, আর যখন আযাবের আয়াত পড়তেন তখন আযাব থেকে মুক্তি চাইতেন। আর যখন এমন কোনো আয়াত পড়তেন, যাতে আল্লাহর পবিত্রতা রয়েছে তখন তিনি তাসবীহ পড়তেন”।[1] তবে বর্ণনাটি এসেছে কিয়ামুল লাইল বা রাতের নফল সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার সময়ে।

وقام أحد الصحابة ــ وهو قتادة بن النعمان رضي الله عنه ــ الليل لا يقرأ إلا (قل هو الله أحد) يرددها لا يزيد عليها

একজন সাহাবী- ক্বাতাদাহ ইবন নু‘মান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু- সারা রাত সালাতে শুধু সূরা এখলাস পাঠ করেন। এ সূরা ছাড়া আর কোনো সূরা তিনি পড়েন নি।[2]

আর সা‘ঈদ ইবন উবাইদ আত-তাঈ রহ. বলেন, আমি সাঈদ ইবন জুবাইরকে রমাদানে ইমামতি করতে দেখেছি, তিনি শুধু নিম্নোক্ত আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করলেন,

---

[1] তা‘যীমু কাদরিস সালাত ১/৩২৭।

[2] বুখারি, ৯/৫৯; আহমাদ, ৩/৪৩।

﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَاۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٧٠ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ ۝٧١ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۝٧٢﴾ [غافر: ٧٠، ٧٢] -

"যারা কিতাব এবং আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি, তা অস্বীকার করে, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যখন তাদের গলদেশ বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, ফুটন্ত পানিতে, অত:পর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।"[1]

কাসেম রহ. বলেন, আমি সা'ঈদ ইবন জুবাইর রহ. কে এক রাত সালাত আদায় করতে দেখেছি, তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পঁচিশ বার তেলাওয়াত করেন,

﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٢٨١﴾ [البقرة: ٢٨١] -

"আর তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা

---

[1] সূরা গাফের, আয়াত: ৭০,৭২।

উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের জুলুম করা হবে না।”[1]

কাইস নামক এক ব্যক্তি যার উপাধি আবু আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, একরাত আমি হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট রাত যাপন করি, তিনি রাতে সালাত আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান হন এবং ভোর পর্যন্ত এ আয়াত- ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ ١٨﴾ [النحل: ١٨] “যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করতে থাক, তবে গণনা করে শেষ করতে পারবে না”।[2] বার বার পড়তে থাকেন। তারপর যখন সকাল হল, আমরা বললাম, হে আবু সা‘ঈদ! আপনি সারা রাত এ আয়াত কেন তিলাওয়াত করলেন? তিনি বললেন, এ আয়াতে আমি উপদেশ পাই। আমি যেদিকে চোখ তুলি ও চোখ ফিরাই সে দিকে কোনো না কোনো নেয়ামত দেখতে পাই। আর আল্লাহর যে নেয়ামত জানা যায় না, তার পরিমাণ অসংখ্য।[3]

হারূন ইবন রুবাব আল উসাইদি রহ. রাতে যখন তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতেন, তখন কখনও কখনও তিনি সকাল পর্যন্ত এ আয়াত-

---

[1] বাকারাহ, আয়াত: ২৮১।

[2] সূরা নাহাল আয়াত: ১৮।

[3] আল্লামা কুরতবী রহ. এর তাযকিরাহ, পৃ: ১২৫।

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيۡتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٧﴾ [الانعام: ٢٧]

“আর যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে আগুনের উপর আটকানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হত। আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!”।[1] বার বার তিলাওয়াত করতেন এবং সকাল পর্যন্ত কান্না-কাটি করতেন।

এ ছাড়াও কুরআন হেফয করা, বিভিন্ন রুকনে পড়ার দো‘আসমূহ হেফয করা ও পড়ার সময় চিন্তা-ফিকির করা বিষয়ে সহায়তা করে।

আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, চিন্তা করা, ফিকির করা, বার বার তিলাওয়াত করা ও বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি খুশুকে বৃদ্ধি করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩ ١٠٩﴾ [الاسراء: ١٠٩]

“আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।[2]”

---

[1] সূরা আন‘আম, আয়াত: ২৭।

[2] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯।

নিম্নে একটি প্রভাবময় ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিন্তা-ফিকির করা ও সালাতে খুশু অবলম্বন করার বর্ণনা আরও স্পষ্ট হয়- আতা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال ابن عمير : حدّثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبكت وقالت : قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبّد لربي ، قالت : قلت : والله إني لأحبّ قربك ، وأحب ما يسرّك ، قالت : فقام فتطهر ثم قام يصلي ، فلم يزل يبكي حتى بلّ حجره ، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلّ الأرض ، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟ قال «أفلا أكون عبدا شكورا ؟ لقد نزلت عليّ الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكّر ما فيها» : (إن في خلق السموات والأرض... الآية

আমি ও উবাইদ ইবন উমাইর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার নিকট প্রবেশ করি, ইবনু উমাইর রহ. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বলল, আপনি আমাদেরকে একটি আশ্চর্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আপনি দেখেছেন। এ কথা বললে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কেঁদে দেন এবং বলেন, এক রাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হে

আয়েশা তুমি আমাকে ছাড়, আমি আমার রবের ইবাদত করি। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি আপনার নৈকট্যকে পছন্দ করি এবং আপনাকে যে জিনিষ খুশি করে আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজু করলেন, তারপর সালাতে দাঁড়ালেন, আর কাঁদতে লাগলেন এমনকি চোখের পানিতে তার কোল ভিজে গেল। তারপর আবারও কাঁদলেন, কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে মাটিও ভিজে গেল। এমতাবস্থায় বিলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এসে সালাতের খবর দিল। অতঃপর যখন দেখতে পেল তিনি কাঁদছেন, তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূল বললেন, "আমি কি শুকর গুজার বান্দা হব না? আজ রাত আমার উপর এমন কতক আয়াত নাযিল হয়েছে, যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করার পর যদি কোনো ব্যক্তি তাতে চিন্তা-ফিকির না করে, তার জন্য রয়েছে ধ্বংস।"

﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠﴾ .... [ال عمران: ١٩٠]

“নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নির্দশন”....।[1]

আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাড়া দেওয়ার একটি উদাহরণ হচ্ছে, সূরা ফাতেহার পর আমীন বলা। এতে রয়েছে অনেক সাওয়াব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا أَمَّنَ الإمام فأَمِّنُوا فإنه مَن وافق تأمِينُهُ تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه»

“যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলবে, যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার অতীত জীবনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে”।[2]

অনুরূপভাবে ইমামের সাথে উত্তর দেয়া। যেমন, ইমাম যখন سمع الله لمن حمده বলবে, তখন মুক্তাদিরা বলবে,ربنا ولك الحمد এতে রয়েছে অনেক সাওয়াব। যেমন, রিফা‘আ ইবন রাফে‘ আয-যুরাকী বলেন,

كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا

---

[1] ইবনু হিব্বান। আর শাইখ আলবানী সিলসিলা সহীহাতে (হাদিস নং ৬৮) বলেন, হাদিসটির সনদ উত্তম।

[2] বুখারি, ৭৪৭।

مباركا فيه، فلما انصرف قال : «من المتكلم » قال : أنا ، قال : « رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولُ.»

"একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করছিলাম, যখন তিনি রুকু হতে মাথা উঠান তখন বলেন, سمع الله لمن حمده ، 'আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তার প্রশংসা করে' এ কথা শোনে পেছন থেকে একলোক বলল, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 'হে রব, তোমার জন্যই অধিক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতময়'। অতঃপর যখন রাসূল সালাত শেষ করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথাটির কথক কে? লোকটি বলল, আমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে আমি দেখছি, তারা কে প্রথমে সাওয়াব লিখবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে"।[1]

(৫) সালাতে কেরাতকে থেমে থেমে পড়া

এটি অর্থ বুঝা ও তাতে চিন্তা করার জন্য অধিক সহজ। আর এটিই হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। যেমন- উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিরাতের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

[1] বুখারি ২/২৮৪।

قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم (بسم الله الرحمن الرحيم ، وفي رواية : ثم يقف ثم يقول ، الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وفي رواية : ثم يقف ثم يقول : ملك يوم الدين) يقطّع قراءته آيةً آية

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কেরাত হল, بسم الله الرحمن الرحيم ، তারপর তিনি থামতেন, তারপর তিনি বলতেন, الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم অপর এক বর্ণনায়, তারপর তিনি থামতেন। তারপর তিনি বলতেন, ملك يوم الدين এভাবে তিনি তার কেরাতকে এক আয়াত এক আয়াত করে তিলাওয়াত করেন"।[1]

আয়াতের মাথায় গিয়ে ওয়াকফ করা সুন্নত, যদিও অর্থটি পরবর্তী আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত।

৬- তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং আওয়াজ সুন্দর করা

যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

ورتل القرآن ترتيلا

[1] আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০০১। আল্লামা আলবানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেন এবং তার বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করেন, ২/৬০।

“আর কুরআনকে তারতীলসহকারে তিলাওয়াত কর।” তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরআন তিলাওয়াত ছিল (مفسرة حرفاً حرفا) বিস্তৃত-অর্থাৎ এক শব্দ, এক শব্দ করে।[1] অপর বর্ণনায়,

(وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা পড়তেন তখন তারতীল সহকারে পড়তেন, এমনকি তার তিলাওয়াত বড় হতে বড় হত”।[2] এ ধরনের তারতীল ও ছেড়ে ছেড়ে পড়া, সালাতে চিন্তা ফিকির করা ও খুশুর জন্য অধিক সহায়ক। তাড়া-হুড়া ও তাড়া-তাড়ি করা, খুশুর সম্পূর্ণ বিপরীত।

সালাতে খুশু আনয়নে আরও যে জিনিষটি সহায়ক হয়, তা হল, কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজকে সুন্দর করা। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপদেশ দেন- তিনি বলেন,

«زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا »

---

[1] মুসনাদে আহমদ ৬/২৯৪; বিশুদ্ধ সনদে। আরও দেখুন, আল্লামা আলবানী রহ. এর ‘সিফাতুস সালাত’ গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা, পৃ. ১০৫।

[2] মুসলিম, হাদিস নং ৭৩৩।

“তোমরা তোমাদের কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজকে সুন্দর কর, কারণ সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত কুরআনের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করে”।[1]

তবে আওয়াজকে সুন্দর করার অর্থ ফাসেক ও বিদ‘আতিদের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা নয়। কুরআনের তিলাওয়াতের আওয়াজকে সুন্দর করার অর্থ হল, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله»

“আওয়াজের দিক দিয়ে সর্বাধিক সুন্দর তিলাওয়াত-কারী ব্যক্তি সে-ই, যখন তোমরা তার তিলাওয়াত শোনবে, তখন তুমি বুঝবে যে লোকটি আল্লাহকে ভয় করে”।[2]

৭- এ কথা জানা যে, আল্লাহ তা‘আলা সালাতে তার কথার উত্তর দেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[1] হাকেম, হাদিস: ১/৫৭৫, সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৩৫৮১।

[2] ইবনু মাজাহ্, হাদিস: ১/১৩৩৯, সহীহুল জামে‘, হাদিস: ২২০২।

«قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال : الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله : أثنى عليّ عبدي ، فإذا قال : مالك يوم الدين ، قال الله : مجّدني عبدي ، فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : إهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার ও বান্দার মাঝে সালাতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে আমার নিকট চায়। যখন বান্দা বলে, ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ (সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক), তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর বান্দা যখন বলে, ‘আর-রাহমানির রাহীম’ (অতিশয় দয়ালু পরম করুণাময়), আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করেছে। আর যখন বলে ‘মালিকি ইয়াওমিদ্দীন’ (বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মানিত করেছে। আর যখন বান্দা বলে, ‘ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তা‘য়ীন’ (আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই), তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর আমার বান্দার জন্য তাই

রয়েছে যা সে আমার নিকট চায়। আর যখন বান্দা বলে, ‘ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন‘আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবে ‘আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন’ (আমাকে সঠিক পথ দেখান, তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয় যাদের উপর আপনার ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট), তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে তা, যা সে চায়”।[1]

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ হাদিস। প্রতিটি মুসল্লি যদি সালাতে হাদিসটির মর্মার্থটিকে অন্তরে উপস্থিত রাখে, তাহলে অবশ্যই তার অন্তরে সর্বোচ্চ খুশু‘ হাসিল হবে এবং সে সূরা ফাতেহার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অনুভব করবে। কেনই বা হবে না, যখন সে বুঝতে পারছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার সাথে কথা বলছেন, তার কথা উত্তর দিচ্ছেন, যা চাচ্ছে তা পাচ্ছে।

সুতরাং একজন বান্দার জন্য করণীয় হল, সে এ কথোপকথনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে এবং যথাযথ মূল্যায়ন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه »

---

[1] মুসলিম, সালাত অধ্যায়; পরিচ্ছেদ: প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা ওয়াজিব হওয়া বিষয়ে আলোচনা।

“যখন কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করতে দাড়ায়, সে তার রবের সাথেই কথা বলছে। সে যেন লক্ষ্য রাখে কিভাবে তার রবের সাথে কথা বলে”।[1]

৮- সূতরাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করা এবং সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ানো

সালাতে খুশু হাসিলের জন্য সহায়ক বিষয়সমূহ হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সুতরা কায়েম করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া ও সুতরার নিকটে দাড়িয়ে সালাত আদায় করা। কারণ, এটি মুসল্লির দৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, শয়তান হতে রক্ষাকারী, সামনে দিয়ে মানুষের চলাফেরা কারণে বিঘ্ন ঘটানো হতে নিরাপদ। কারণ, সুতরা না থাকলে এগুলো মুসল্লির সালাতে বিঘ্ন ঘটায় এবং মুসল্লির সালাতের সাওয়াবকে কমিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة و ليدن منها »

“যখন কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করে, তখন সে যেন, সুতরার দিকে সালাত আদায় করে এবং সুতরার কাছাকাছি দাড়ায়”।[2]

---

[1] মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/২৩৬; সহীহুল জামে‘, হাদিস: ১৫৩৮।

[2] আবু দাউদ, হাদিস: ৬৯৫, ১/৪৪৬। সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৬৫১।

সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ানোতে অনেক উপকার রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته »

“তোমরা যখন সুতরা স্থাপন করে সালাত আদায় করবে, তখন সুতরার নিকটে দাঁড়াবে, যাতে শয়তান সালাতকে নষ্ট করতে না পারে”।[1] সুতরা স্থাপনের সুন্নাত তরিকা হল, সুতরাটির মধ্যে ও লোকটির মধ্যে তিন হাত পরিমাণ দূরত্ব হবে। আর সেজদার স্থান ও সুতরার মাঝে এক ছাগল অতিক্রম করার স্থান পরিমাণ দূরত্ব হবে। যেমনটি বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে বর্ণিত।[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লিকে এ অসিয়ত করেন, যাতে কাউকে তার ও সুতরার মাঝে অতিক্রম করতে অনুমতি না দেয়। তিনি বলেন,

«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، و ليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين»

“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, সে যেন কাউকে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে না দেয়। সে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে তাকে প্রতিহত করবে। তারপরও যদি সে অস্বীকার করে,

---

[1] আবু দাউদ হাদিস: ৬৯৫, ১/৪৪৬, সহীহুল জামে‘ ৬৫০।

[2] বুখারি, ফতহুল বারী দেখুন। ১/৫৭৪, ৫৭৯।

তবে তার সাথে মুকাবালা করবে। কারণ তার সাথে রয়েছে শয়তান”।[1]

ইমাম নববী রহ. বলেন, “সুতরা স্থাপন করার হিকমত হল, সুতরার বাহিরের দিক তাকানো হতে মুসল্লি তার চক্ষুকে বিরত রাখা এবং মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা প্রদান করা। শয়তানকে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে বাধা দেওয়া, আর শয়তান দ্বারা তার সালাত নষ্ট করার সুযোগ না দেওয়া।”[2]

৯- ডান হাতকে বাম হাতের উপর ছেড়ে দিয়ে বুকের উপর রাখা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, «وضع يده اليمنى على اليسرى» “ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন”।[3] আর তিনি উভয় হাতকে বুকের উপর রাখতেন। যেমন, হাদিসে বর্ণিত, «كان يضعهما على الصدر» অর্থাৎ বুকের উপর দুটি হাতকে রাখতেন।[4] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[1] মুসলিম, হাদিস ১/২৬০ সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৭৫৫।

[2] দেখুন, সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা, ৪/২১৬।

[3] মুসলিম, হাদিস নং ৪০১।

[4] আবুদাউদ, হাদিস ৭৫৯। দেখুন ইরওয়াউল গালীল: ২/৭১। তবে আবু দাউদের শব্দ হচ্ছে, «يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» এর সনদটি মুরসাল। [সম্পাদক]

এরশাদ করেন, «إنا معشر الأنبياء أمرنا.. أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» "আমরা নবীদের জামাত, আমাদেরকে সালাতে আমাদের ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে"।[1] ইমাম আহমদ রহ. কে সালাতের দণ্ডায়মান অবস্থায় এক হাত অপর হাতের উপর রাখার অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, এটি আল্লাহর সামনে নিজেকে অপমান অপদস্ত করা।[2] আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন, ওলামাগণ বলেন, এ অবস্থার হিকমত হল, এটি একজন বিনয়ী ফকীরের গুণাগুণ। এটি যে কোনো প্রকার বেহুদা কাজ করা থেকে নিরাপদ এবং বিনয়াবনত হওয়ার কাছাকাছি।[3]

১০- সেজদার দিক দৃষ্টি রাখা:

কারণ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

(كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى طأطأ رأسه و رمى ببصره نحو الأرض)

---

[1] মুজামে কবীরে আল্লামা তিবরানী, হাদিস: ১১৪৮৫। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, আল্লামা তীবরানী হাদিসটিকে আওসাতে উল্লেখ করেন এবং হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী; আল-মাজমা: ৩/১৫৫।

[2] দেখুন, আল্লাম ইবনু রজব রহ. এর আল-খুশু ফিস সালাত, পৃ: ২১।

[3] দেখুন, ফতহুল বারী: ২/২২৪।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন মাথা ঝুঁকাতেন এবং চোখ দ্বারা যমিনের দিক দৃষ্টি দিতেন”।[1]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত,

(و لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج عنها).

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কা‘বা ঘরে প্রবেশ করেন, বের না হওয়া পর্যন্ত তার দৃষ্টি সেজদার স্থান হতে অন্য দিকে ফেরান নি”।[2]

আর যখন তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসবেন, তখন ইশারার আঙ্গুল যেটি নাড়া-চাড়া করছেন, তার দিকে তাকাবেন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত,

(أنه كان إذا جلس للتشهد يشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها)

---

[1] হাকেম, হাদিস নং ১/৪৭৯। আর তিনি বলেন, হাদিসটি শাইখাইনের শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। আল্লামা আলবানী রহ. সালাতের হাদিসটি বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। পৃ: ৮৯।

[2] হাকেম ১/৪৭৯ মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাদিসটি শাইখাইনের শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। আল্লামা যাহাবী রহ. হাদিসটি বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। আল্লামা আলবানী রহ. তাদের উভয়ের সাথে একমত পোষণ করেন; দেখুন, এরওয়াল গালিল: ২/৭৩।

"যখন তিনি তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন, তখন তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলের- সাথে মিলিত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করতেন এবং চোখ দ্বারা তার দিক দৃষ্টি দিতেন"।[1]

মাসআলা:

এখানে একটি প্রশ্ন কতক মুসল্লির অন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর তা হল, সালাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ রাখার বিধান কি, বিশেষ করে, যখন কোনো মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে, তখন সে সালাতে অধিক খুশু ও মনোযোগ অনুভব করে তখন চোখ বন্ধ করে রাখা যাবে কিনা?

উত্তর: একটু আগেই অতিবাহিত হয়েছে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নিয়মপদ্ধতির পরিপন্থী। কারণ, চোখ বন্ধ করা দ্বারা সেজদা স্থান ও আঙ্গুলের দিক তাকানোর সুন্নাত ছুটে যায়। তবে এখানে বিষয়টিতে বিশ্লেষণ আছে। আমরা ময়দানকে অশ্বারোহীর জন্য ছেড়ে দিলাম। আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল কাইউম রহ. বিষয়টি বর্ণনা করেন এবং স্পষ্ট করেন, তিনি বলেন, "সালাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত বা আদর্শ নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু

[1] ইবনু খুযাইমা: ১/৩৫৫; হাদিস: ৭১৯। আর মুহাক্কিক বলেন, হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ। দেখুন, সালাতের পদ্ধতি, পৃ: ১৩৯। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, (وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته) মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৪/৩, আবু দাউদ, হাদিস: ৯৯০।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদ পড়ার সময় দো'আতে চোখ দ্বারা আঙ্গুলের দিক দৃষ্টি দিতেন। তার দৃষ্টি তার ইশারার বাইরে যেত না। এছাড়াও সালাতুল কুছুফে (সূর্যগ্রহণের সালাতে) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত দেখেন, তখন তিনি আঙ্গুরের থোকা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ান। অনুরূপভাবে জাহান্নাম দেখা, জাহান্নামে বিড়ালকে কষ্টদানকারীকে দেখা এবং বাঁকা লাঠিধারীকে দেখা (যে লাঠির মাধ্যমে মানুষের সম্পদ নিয়ে নিত)। অনুরূপভাবে, রাসূল কর্তৃক তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জন্তুকে অতিক্রম করা থেকে বাধা প্রদান, অনুরূপভাবে ছেলে শিশু মেয়ে শিশুকে সামনে দিয়ে গমন করতে বাধা প্রদান। দু' কন্যা সন্তানের মাঝে বাধা দেওয়া। অনুরূপভাবে, সালাতের মধ্যে থাকা অবস্থায় এক লোক তাকে সালাম দিলে, ইশারা করে, তার সালামের উত্তর দেয়া। কারণ, তিনি তো শুধু যাকে দেখেন তার প্রতিই ইশারা করেন। অনুরূপভাবে, সালাতের মধ্যে শয়তান সামনে এলে, তিনি তাকে ধরে গলা টিপে দেন। আর এটি তো ছিল তখনই, যখন তিনি তাকে চোখে দেখেন। এ সব উল্লেখিত হাদিস এবং এ ছাড়াও আরও অন্যান্য হাদিসসমূহ প্রমাণ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে রাখতেন না।

তবে সালাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ রাখা মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে ফিকাহ-বিদদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আহমদ ও তার সঙ্গীরা বলেন, মাকরূহ। তারা বলেন, এটি ইয়াহূদীদের কর্ম। অপর এক জামাত আলেম এটিকে মুবাহ বলেন, মাকরুহ বলেন না। তবে বিশুদ্ধ কথা হল, যদি চোখ খোলা রাখা দ্বারা সালাতে খুশুর বিঘ্ন না ঘটে তাহলে, চোখ খোলা রাখা উত্তম। আর যদি কিবলার দিক সাজ-সজ্জা, চাক-চিক্ক ও সৌন্দর্য ইত্যাদি থাকে, যা তার অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে, আর তা থাকার কারণে, সালাতে খুশু অবলম্বন করার বিঘ্ন ঘটে, তাহলে চোখ বন্ধ রাখা কখনোই মাকরূহ হবে না। আর এ অবস্থার আলোকে চোখ বন্ধ রাখাকে মাকরুহ না বলে, মোস্তাহাব বলা, শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যসমূহের অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহই ভালো জানেন।[1]

এতে এ কথা স্পষ্ট হয়, সুন্নত হল, চোখ বন্ধ না রাখা। তবে যদি প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ খুশুতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন কোনো কাজকে প্রতিহত করতে চোখ বন্ধ রাখে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

১১- মধ্যমা আঙ্গুলকে নাড়ানো:

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা পালনে অনেক মুসল্লিই উদাসীন। এমনকি তারা এর বিরাট উপকারিতা ও খুশু অবলম্বনে এর প্রভাব

---

[1] যাদুল মা'আদ: ১/২৯৩।

সম্পর্কেও অজ্ঞ। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لهي أشد على الشيطان من الحديد»

"এটি শয়তানের জন্য লোহা-পিটার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক"।[1] অর্থাৎ সালাতে তাশাহ্হুদ পড়ার সময় মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা, শয়তানের জন্য লোহা দিয়ে পেটানোর চেয়েও কষ্টকর। কারণ, এটি আল্লাহর একত্ববাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ইবাদতে ইখলাস অবলম্বনে সহায়ক হয়। আর এ দুটি বিষয় সবচেয়ে বড় বিষয় হওয়াতে শয়তান এ আমলটি খুবই অপছন্দ করে। আমরা আল্লাহর নিকট তার থেকে আশ্রয় চাই[2]।

এ আমলটি অধিক উপকারী এবং মহৎ হওয়ার কারণে, সাহাবীগণ একে অপরকে আমলটির বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তারা আমলটির উপর অধিক যত্নবান ছিলেন, আমলটি করার বিষয়ে তারা নিজেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ আমলটি গুরুত্বহীন মনে করে ছেড়ে দেয়। সাহাবীগণের বিষয়ে বর্ণিত,

---

[1] হাসান সনদে ইমাম আহমদ: ২/১১৯। সালাতের পদ্ধতি, পৃ: ১৫৯।

[2] আল-ফাতহুর রাব্বানী, লিস সা'আতী, ৪/১৫।

“তারা একে অপরকে বিষয়টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন।[1]” অর্থাৎ দো‘আর সময় আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করার বিষয়ে।

আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার সুন্নত পদ্ধতি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাশাহ্হুদ পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত তর্জনী আঙ্গুলটি উঁচা করে রেখে কিবলার দিক ইশারা করে নাড়তে থাকা।

১২- সালাতে কুরআনের সূরা, আয়াত, যিকির ও দো‘আ ইত্যাদিতে ভিন্নতা আনা:

একজন মুসল্লিকে যখন সালাতে বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন ধরনের যিকির ও দো‘আ পাঠ করবে, তখন এটি তার মধ্যে নতুন নতুন অনুভূতির যোগান দেবে এবং তার মধ্যে নতুনত্ব আনয়নে সহায়ক হবে। তবে যারা সীমিত কয়েকটি সূরা বিশেষ করে শুধু ছোট সূরাগুলো মুখস্থ করে বা দু একটি দো‘আ মুখস্থ করে, এটি তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। মোটকথা, (সূরা, আয়াত, যিকির, দো‘আ

---

[1] সাহাবীদের আমলে বর্ণিত আছে,

(كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض. يعني : الإشارة بالأصبع في الدعاء)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ একে অপরকে পাকড়াও করতেন। অর্থাৎ, দো‘আয় আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করার বিষয়ে।

ইবনু আবি শাইবা বিশুদ্ধ সনদে। আলবানী, সিফাতুস সালাত, পৃ: ১৪১।

ইত্যাদিতে) ভিন্নতা অবলম্বন করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত এবং সালাতে খুশুর পরিপূরক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সালাতে যা তিলাওয়াত করতেন এবং যিকির করতেন সেগুলো নিয়ে গবেষণা করলে, আমরা এ ভিন্নতা দেখতে পাব। যেমন,

সালাত শুরু করার পর যে দো‘আটি পাঠ করা হয়, সে দো‘আ বিষয়ে আমরা একাধিক বর্ণনা দেখতে পাই। যেমন, একটি বর্ণনায় এ দো‘আটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

«اللّٰهُمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللّٰهُمَّ نقني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدّنس ، اللّٰهُمَّ اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرَد »

"হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমনটি করেছেন আসমান ও যমিনের মাঝে। হে আল্লাহ আপনি আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেমনিভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে পানি, শিশির ও বরফ দ্বারা ধুয়ে দিন।"

আবার একটি বর্ণনায় এ দো‘আটি পড়ার কথা বলা হয়েছে:

« وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمِرتُ وأنا أول المسلمين »

“আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে সে সত্তার জন্য নিবিষ্ট করছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার নুসুক (ইবাদাত ও কুরবানী) আমার জীবন ও আমার মরণ সবই সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর জন্যই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এরই প্রতি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই প্রথম মুসলিম, (আত্মসমর্পনকারী)।”

আবার এ দো‘আটিও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত:

« سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك »

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করছি। আপনার নাম অতি বরকতপূর্ণ, আপনার শান সমুচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই”।

ইত্যাদি দো‘আ যিকিরগুলো সম্পর্কে বিধান হল, একজন মুসল্লি এক এক সময় এক একটি দো‘আ পড়বে।

আর ফজরের সালাতের সূরা পড়া সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিন্ন ভিন্ন অনেক বরকতময় কর্ম আমরা পেয়ে থাকি। যেমন, তিনি কখনো 'তিওয়ালে মুফাসসাল' তথা ওয়াকি'আ, তূর, ক্বাফ ইত্যাদি পড়তেন। আবার কখনো 'কিসারুল মুফাসসাল তথা, আস-সামছ, কুওয়িরাত, যিলযাল, ও ফালাক-নাস পড়তেন। আবার কখনো কখনো, সূরা রূম, ইয়াছিন ও সাফফাতও পড়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আর জুমার দিন ফজরের সালাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা সেজদা ও ইনসান পড়তেন।

যোহরের সালাতে দুই রাকাতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। এছাড়াও তিনি যোহরের সালাতে সূরা তারেক, বুরুজ ও লাইল পড়তেন।

আছরের সালাতে দুই রাকাতে পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। এছাড়াও তিনি আছরের সালাতে যোহরের সালাতে বর্ণিত সূরাগুলোও (অর্থাৎ সূরা তারেক, বরুজ, লাইল) পড়তেন।

মাগরিবের সালাতে তিনি কিসারুল মুফাসসাল থেকে পড়তেন, যেমন, সূরা আত-তীন তিলাওয়াত করতেন। এছাড়াও তিনি মাগরিবের সালাতে সূরা তূর, মুরসালাত ইত্যাদি পড়তেন।

এশারের সালাতে ‘ওয়াসাতুল মুফাসসাল’ তথা সূরা- আশ-শামস, ইনশিক্কাক ইত্যাদি সূরা তিলাওয়াত করতেন। আর মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’কে সূরা আ‘লা, কলম ও লাইল পড়ার নির্দেশ দেন।

তাহাজ্জুদের সালাতে তিনি ‘তিওয়ালাস সূওয়ার’ তথা লম্বা লম্বা সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। তাহাজ্জুদের সালাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিলাওয়াতের সুন্নত সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি দুইশ ও দেড়শ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। আবার কখনো কখনো কেরাআত ছোটও করতেন।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর তাসবীহ সব সময় একটি পড়তেন না, এক এক সময় এক একটি পড়তেন। যেমন, কখনো তিনি পড়তেন-

(سبحان ربي العظيم)

কখনো পড়তেন-

(سبحان ربي العظيم وبحمده)

কখনো পড়তেন,

(سُبّوح قُدّوس رب الملائكة والروح)

কখনো পড়তেন,

(اللَّهُمَّ لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي ، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين).

রুকু থেকে উঠার পর তিনি বলতেন,

(سمع الله لمن حمده) : (ربنا ولك الحمد)

আবার কখনো বলতেন,

(ربنا لك الحمد)

কখনো বলতেন,

(اللَّهُمَّ ربنا (و) لك الحمد)

আবার কখনো আরও বাড়িয়ে বলতেন,

(ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)

আবার কখনো এ কথা বাড়িয়ে বলতেন,

(أهل الثناء والمجد ، اللَّهُمَّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ)

ইত্যাদি।

সেজদার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(سبحان ربي الأعلى)

বলার সাথে কখনও কখনও এর সাথে বাড়িয়ে আরও বলতেন,

(سبحان ربي الأعلى وبحمده)

এছাড়াও তিনি বলতেন,

(سُبّوح قدوس رب الملائكة والروح)

আরও বলতেন,

(سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفر لي)

এবং

(اللّٰهُمَّ لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين)

ইত্যাদি।

দুই সেজদার মাঝখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(رب اغفر لي رب اغفر لي)

এ কথাটি বলতেন।

আবার কখনো আরও বাড়িয়ে বলতেন,

(اللّٰهُمَّ اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني)

অনুরূপভাবে তাশাহ্হুদ বিষয়ে হাদিসে একাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন একটি বর্ণনায় এসেছে,

(التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا و علي عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

(التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي... الخ)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

(التحيات الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي... الخ).

ইত্যাদি।

সুতরাং একজন মুসল্লি শুধু একটি পড়বে না বরং কখনো এটি আবার কখনো অপরটি পড়বে।

সালাতে দরূদ পড়া সম্পর্কে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক দরূদ বর্ণিত। যেমন-

(اللَّهُمَّ صلّ عل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

অপর বর্ণনায় এসেছে,

(اللّٰهُمَّ صلّ على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

(اللّٰهُمَّ صلّ على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد).

এভাবে আরও বিভিন্ন প্রকারের দরূদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। **সুতরাং**, এসব ক্ষেত্রে সুন্নাত হল, বিভিন্ন সময় বিভিন্নটি পড়া। আর মজবুত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া বা বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা সাহাবীগণ সালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট দো‘আ শেখান, অন্যটি না শেখান, তবে এসব কারণে যে কোনো একটিকে সব সময় পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। উপরে যে সব দলীল ও দো‘আ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সবই আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. এর লিখিত ‘সিফাতু সালাতির রাসূল’ বা ‘রাসূলল্লাহর সালাত আদায় পদ্ধতি’ নামক কিতাব হতে সংগৃহীত।

যেগুলোকে হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাবসমূহ থেকে তিনি একত্র করেছেন।

১৩- তিলাওয়াতের সেজদা তিলাওয়াত করার সাথে সাথে সেজদা করা:

কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম হল, যখন তিলাওয়াত করবে, সেজদা করবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে নবী ও সালে-হীনদের এ বলে, প্রশংসা করেন,

﴿إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا ۩ ٥٨﴾ [مريم: ٥٨]

"যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পড়ত"।[1] আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এখানে উপরোক্ত ক্রন্দন ও সেজদাকারীদের অনুসরণ ও তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাজদাহ করার বিষয়ে আলেমগণ একমত।[2]

সালাতের মধ্যে তিলাওয়াতের সেজদা করা বড়ই মহৎ কাজ। এতে সালাতের মধ্যে মনোযোগ ও খুশু বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[1] সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৫।

[2] তাফসীরুল কুরআনিল 'আজিম ৫/২৩৮।

﴿وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩ ١٠٩﴾ [الاسراء: ١٠٩]

'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে'।[1]

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত তিনি সালাতে সূরা নজম তিলাওয়াত করে সেজদা করছেন।

আর ইমাম বুখারি স্বীয় সহীহে আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' সাথে এশারের সালাত আদায় করি, তিনি তখন সালাতে

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ ١﴾ [الانشقاق: ١]

তিলাওয়াত করেন এবং সেজদা করেন। আমি তাকে সেজদা করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, আমি আবুল কাশেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে, সেজদা করেছি, সুতরাং আমি সব সময় সেজদা করতে থাকবো যতদিন পর্যন্ত তার সাথে আমার সাক্ষাত না হয়। [বুখারি, কিতাবুল আযান, এশারের সালাতে কিরাত জোরে পড়া বিষয়ে আলোচনা।]

[1] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯।

মোটকথা, সালাতের মধ্যে তিলাওয়াতে সেজদাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সালাতে তিলাওয়াতের সেজদা আদায় করা দ্বারা শয়তানকে অপমান অপদস্ত করা ও তাকে কাঁদানো হয়। ফলে সালাতে তিলাওয়াতের সেজদা আদায় করা, মুসল্লিদের ধোঁকা দেয়া হতে শয়তানকে দুর্বল করে দেয়।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا قرأ ابن آدم السجدة، اعتزل الشيطان يبكي، يقول : يا ويله، أمر بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت، فلي النار»

"যখন আদম সন্তান সেজদার আয়াত পড়ে সেজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় এবং বলে, হে আমার দুর্ভোগ! আদম সন্তানকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন সে সেজদা করছে, ফলে তার জন্য রয়েছে, জান্নাত। আর আমাকে সেজদা করার নির্দেশ করা হয়েছে, আমি তা অমান্য করছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম"।[1]

১৪- আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা:

[1] বর্ণনায়, ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ, হাদিস নং ১৩৩।

শয়তান আমাদের পরম দুশমন। শয়তানের শত্রুতা হল, সে একজন মুসল্লিকে তার সালাতের মধ্যে কু-মন্ত্রণা ও ওয়াস-ওয়াসা দেয়; যাতে তার খুশু‘ চলে যায়, আর এভাবেই সে তার সালাতে বিভ্রান্তি তৈরী করে।

“প্রত্যেক ব্যক্তি যখনই আল্লাহর যিকির বা কোনো ইবাদতের দিক মনোযোগ দেয়, তখনই শয়তান তাকে বিভিন্ন ধরনের কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। সুতরাং একজন বান্দার জন্য জরুরী হল, সে ইবাদতে ধৈর্য ধারণ করবে, অটল ও অবিচল থাকবে এবং ইবাদত, যিকির ও সালাতে সর্বদা নিমগ্ন থাকবে, কোনো প্রকার অস্বস্তি প্রকাশ করবে না। কারণ, ইবাদতে লেগে থাকার মাধ্যমে শয়তানের ষড়যন্ত্র তার থেকে দূরে সরে যাবে।

﴿إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦﴾ [النساء : ٧٦]

“নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল”।[1]

আর যখনই একজন বান্দা অন্তর দ্বারা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হতে চায়, তখন অন্য কোন বিষয় তার সামনে এসে তাকে কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। শয়তান হল, ছিনতাইকারী ও ডাকাতের মত। যখন কোনো বান্দা আল্লাহর দিকে রওয়ানা করে, শয়তান তখন তাকে হাইজ্যাক করতে চায়। এ কারণে কোনো

[1] সূরা নিসা, আয়াত: ৭৬।

পূর্বতম মনিষী (সালাফ)কে বলা হল, ইয়াহূদী ও নাসারারা বলে, "তাদের শয়তান কু-মন্ত্রণা দেয় না। তিনি বললেন, সত্য কথাই বলছে। নষ্ট ঘরে শয়তান প্রবেশ করে লাভ কি।"[1]

এ বিষয়টিকে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হল, তিনটি ঘর: একটি বাদশাহর ঘর তার মধ্যে রয়েছে, বাদশাহর ধন-ভাণ্ডার, খাজানা ও মণিমুক্তা। অপর ঘর একজন দাসের ঘর, তাতে রয়েছে, দাসের ধন-ভাণ্ডার, খাজানা ও মণিমুক্তা, তবে তা বাদশাহর ধন-সম্পদের সাথে তুলনীয় নয়। আরেকটি ঘর তা একেবারেই খালি, তাতে কিছুই নেই। যখন চোর আসবে, সে কোন ঘরে প্রবেশ করবে এবং কোন ঘর থেকে চুরি করবে?।[2]

"যখন বান্দা সালাতে দাড়ায় তখন তার উপর শয়তানের ঈর্ষা-হিংসা ও দ্বেষ চলতে থাকে। কারণ, তখন বান্দা একটি মহান ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্থানে দাঁড়িয়েছে এবং শয়তানের জন্য সবচেয়ে অধিক কষ্টদায়ক ও কঠিন স্থানে অবস্থান করছে। একজন বান্দা যাতে সালাতকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে না পারে, সে জন্য শয়তান যাবতীয় চেষ্টাই করতে থাকে। তাকে বিভিন্ন ধরনের আশা দেয়, প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সালাতকে ভুলিয়ে দিতে সব চেষ্টাই সে করে। শয়তান একজন বান্দাকে সালাত

---

[1] মাজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৬০৮

[2] আল ওয়াবিলুস সাইয়্যেব: ৪৩

থেকে বিরত রাখার জন্য হাতি-ঘোড়াসহ তার সব ধরনের সৈন্যকে ব্যবহার করে এবং আরও যা যা ব্যয় করা দরকার তার সবই সে ব্যয় করতে থাকে, যাতে বান্দাটি সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করে এবং সালাতের প্রতি যত্নবান ও মনোযোগী না হয়। শয়তানের এ ধরনের টানা-হেঁচড়া ও যুদ্ধ ঘোষণা করার কারণে বান্দা অনেক সময় সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করে এবং সে সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয়। আর যখন শয়তান কোনো বান্দার ক্ষেত্রে অক্ষম হয় এবং বান্দা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার না করে, আর সালাতে দাঁড়িয়ে (আল্লাহর নৈকট্য লাভের) এ মহান অবস্থানে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহর দুশমন একজন বান্দার মাঝে ও তার অন্তরের মাঝে অবস্থান করে এবং বান্দার মাঝে ও অন্তরের মাঝে সালাতে যাতে মনোযোগী হতে না পারে সে জন্য দেয়াল তৈরি করে। তারপর সে সালাতে বান্দাকে এমন সব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা সালাত আরম্ভ করার পূর্বে স্মরণ করানো হয় নি। এমনকি দেখা যায়, কোনো বিষয় ও প্রয়োজন এমন আছে, যা বান্দা একেবারে ভুলে গেছে এবং তা হতে সে নিরাশ হয়ে গেছে, এ ধরনের বিষয়গুলো শয়তান সালাতের মধ্যে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে তার অন্তরকে সালাত থেকে ফিরিয়ে নেয়া যায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা যায়। ফলে সে সালাতে নিষ্প্রাণ হয়ে (আল্লাহর সামনে) দাঁড়ায়। আল্লাহকে সামনে রেখে মনোযোগ সহকারে সালাত আদায়কারী যেভাবে আল্লাহর

নৈকট্য লাভ ও সাওয়াব হাসিল করে, সে তার কোন কিছুই লাভ করতে পারে না। ফলে সে যেভাবে খালি হাতে সালাতে দাড়িয়ে ছিল, সেভাবে খালি হাতেই সালাত থেকে গুনাহের বোঝা নিয়ে বের হয়ে আসে। সালাত আদায়ের কারণে তার গুনাহের বোঝা একটুও হালকা হয় না। কারণ, সালাত ঐ ব্যক্তির গুনাহগুলো দূর করে, যে সালাতের হক আদায় করে, সালাতকে মনোযোগ সহকারে আদায় করে, সালাতে খুশুকে পরিপূর্ণ করে এবং সালাত আদায় করার সময় আল্লাহর সামনে মনোযোগ সহকারে দাড়ায়।[1]

শয়তানের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা ও শয়তানের কুমন্ত্রণাকে দূর করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্ন লিখিত চিকিৎসার প্রতি দিক নির্দেশনা দেন। আবুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبِّسها عليّ ، فقال رسول الله صلى عليه وسلم : «ذاك شيطان يُقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا». قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.

"হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার সালাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং আমার কেরাআত পড়ার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[1] আল ওয়াবিলুস সাইয়্যেব: ৩৬।

বললেন, এটি শয়তান, এর নাম ‘খানযাব’। যখন তুমি তা অনুভব করবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান হতে আশ্রয় চাও এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেল। তিনি বলেন, আমি কাজটি করলে, আল্লাহ তা‘আলা আমার থেকে তা দূর করে দেন”।[1]

সালাত আদায়কারীকে শয়তানের ধোঁকা দেয়া ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং তিনি বলেন,

«إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه - يعني خلط عليه صلاته وشككه فيها - حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس»

“যখন তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি সালাতে দাড়ায়, শয়তান এসে তাকে বিপাকে ফেলে। অর্থাৎ তার সালাতকে এলোমেলো করে দেয় এবং সালাতের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে। ফলে সে কত রাকাত সালাত আদায় করল, তা ভুলে যায়। যখন তোমাদের এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, তখন বসা অবস্থায় তোমরা দুটি সেজদা করে নিবে”।[2]

---

[1] মুসলিম: ২২০৩।

[2] বুখারি, সেজদা সাহু অধ্যায়: নফল ও ফরয সালাতে সেজদা সাহুর করার আলোচনা।

অনুরূপভাবে শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে আমাদের আরও সংবাদ দেন যে,

«إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث ، فأشكل عليه ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»

“যখন তোমাদের কেউ সালাতে থাকা অবস্থায় তার পায়ু পথে নড়-চড় অনুভব করে এবং ওজু ভঙ্গ হল কি হল না সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছে না, সে যেন যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আওয়াজ না শোনে বা হাওয়া না বের হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত না ছাড়ে”।[1]

বরং শয়তানের ষড়যন্ত্র অনেক সময় আশ্চর্য রূপ ধারণ করে। যেমনটি এ হাদিস তা স্পষ্ট করে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيّل إليه في صلاته أنه أحدث ولم يُحدِث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يُحدث ، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرفن حتى يسمع صوت ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه»

---

[1] মুসলিম, হাদিস: ৩৮৯।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যার মনে হচ্ছে যে, সালাতে তার বায়ু বের হয়ে ওজু ভঙ্গ হয়েছে অথচ তার ওজু ভঙ্গ হয় নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “শয়তান তোমাদের সালাতে উপস্থিত হয়ে তার পায়ু পথ খোলে দেয়, ফলে সে মনে করে তার ওজু নষ্ট হয়ে গেছে অথচ তার ওজু নষ্ট হয় নি। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে যে সালাত থেকে ফিরে না যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ কানে পায়ুর আওয়াজ শুনতে না পায় অথবা নাকে তার দুর্গন্ধ অনুভব না করে”।[1]

মাসআলা

সালাতে শয়তানের এক প্রকার ধোঁকা আছে, যে ধোঁকাটি ‘খানযাব’ নামের শয়তান মুসল্লিদের মধ্যে যারা ভালো তাদেরকে দিয়ে থাকে। আর তা হল, মুসল্লিদের মনোযোগকে সালাত থেকে সরিয়ে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর দিকে নিয়ে যায়। যেমন, মুসল্লিদের মনোযোগকে কোন দাওয়াতি কাজের প্রতি মগ্ন করে

---

[1] তাবরানী, খণ্ড ১১, পৃ: ২২২, হাদিস: ১১৫৫৬; মাজমায়ুয যাওয়েদ ১/২৪২ গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

দেয়া অথবা কোনো ফিকহী মাসআলার মধ্যে চিন্তা মগ্ন করে দেয়। ফলে তারা তাদের সালাতের একটি অংশে কি করল তা বুঝতেই পারে না। আবার কোনো কোনো সময় অনেকে এ মনে করে ধোঁকায় পড়ে যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' সালাতে সৈন্য পরিচালনা করতেন। [সুতরাং, আমাদের জন্যও সালাতে কোনো ফিকহী মাসআলা বা দ্বীনি বিষয়ে চিন্তা করা বৈধ, তা সালাতে খুশুর পরিপন্থী নয়।] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এ বিষয়টিকে পুরোপুরি স্পষ্ট করেন এবং এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেন।

তিনি বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' এর উক্তি, 'আমি সালাতে আমার সৈন্য প্রস্তুত করি' এটি তার জন্য খাস ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কারণ, ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' আমীরুল মুমিনীন হওয়ায়, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন এবং তিনি জিহাদেরও আমীর। ফলে তিনি এক দিক দিয়ে ঐ মুসল্লির মত, যে দুশমনের মুখোমুখি হওয়া অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে ভীতির সালাত আদায় করছে। হয়ত সে যুদ্ধরত অথবা সে যুদ্ধরত নয়, তবে সর্বাবস্থায় সে সালাতেও আদিষ্ট এবং জিহাদেও আদিষ্ট। সুতরাং তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার জন্য দুটি আদেশই পালন করা ওয়াজিব। তাকে যথাসাধ্য দুটি আদেশই পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥﴾ [الانفال: ٤٥]

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও"।[1] আর এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়, জিহাদ চলাকালীন অন্তরের অবস্থা, আর অন্য সময় যখন জিহাদ চলে না, সে সময়ের অন্তরের অবস্থা কখনোই এক হবে না। তখন যদি ধরে নেয়া হয়, জিহাদের কারণে সালাতে কোনো প্রকার দুর্বলতা পাওয়া যায় বা সালাত ছাড়া অন্য কোন দিক মনোযোগ যায়, তা বান্দার ঈমানের পরিপূর্ণতা ও আনুগত্যটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না এবং এতে বান্দা কোন প্রকার দোষীও সাব্যস্ত হয় না।

এ কারণেই সালাতুল খাওফকে অন্য সময়ের সালাতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যখন সালাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করেন, তখন বলেন,

﴿فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء : ١٠٣]

[1] সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৫।

“অতঃপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।[1] সুতরাং নিরাপদ অবস্থায় যে সালাত রকম কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ভীতির সময়ে সে রকম সালাত কায়েমের নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

এ ছাড়াও মানুষ এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আছে। যখন বান্দার ঈমান মজবুত ও শক্তিশালী হবে, তখন সে অন্যান্য কাজগুলোর ফিকির করার সাথে সাথে সালাতেও মনোযোগী হতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা‘আলা ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ এর মুখে ও অন্তরে সত্যকে প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি ছিলেন ‘মুহাদ্দিস’ তথা সত্যকথক ও ‘মুলহাম’ তথা সত্যের দিক-নির্দেশনাপ্রাপ্ত। তার মত ব্যক্তির পক্ষে সালাতের মধ্যে সৈন্য পরিচালনা করার সাথে সাথে অন্তরের পূর্ণ উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অন্যদের জন্য সেটা সম্ভব নয়। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, সালাতে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার বিষয়টি আগমন করার চেয়ে সেটা না আসলে সালাতে অন্তর বেশী হাজির হয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত নিরাপদ অবস্থায় ভীতির অবস্থার তুলনায় অধিক পরিপূর্ণ। আল্লাহ যেহেতু ভীতির অবস্থায় সালাতের অনেকগুলো ওয়াজিব আদায় না করাকে

[1] সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩।

ক্ষমা করে দেন, তাহলে অন্তরের অবস্থা-তো আরও অধিক ক্ষমা যোগ্য।

মোটকথা, একজন মুসল্লি স্বীয় সালাতে ওয়াজিব কোনো বিষয়ে চিন্তা করা, যার চিন্তা করার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, (সালাতের পরে যা করার মত সময় নেই), আর ওয়াজিব নয় বা যার সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় নি, (সালাতের পরও যেটা নিয়ে চিন্তা করার প্রচুর সময় রয়েছে) এমন বিষয়ে সালাতে চিন্তা করা এক রকম নয়। হতে পারে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্য ঐ সময় সেনাবাহিনীর কথা চিন্তা করা ছাড়া আর কোনো সময় ছিল না। তিনি উম্মতের ইমাম এবং তার নিকট মানুষের কাছ থেকে আগত সমস্যা অসংখ্য। প্রতিটি মানুষ তার মর্যাদা অনুযায়ী এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর মানুষ সালাতে এমন সব বিষয় স্মরণ করে, যা সালাতের বাহিরে সে স্মরণ করে না। সালাতে মানুষের এ সবকিছু সাধারণত শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়। যেমন, সালাফে সালেহীন থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত, এক লোক তার কিছু টাকা পয়সা মাটিতে পুঁতে রাখে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে, লোকটি তার টাকা পয়সা কোথায় পুতে রেখেছে, তা ভুলে যায়। তখন তাকে কোনো এক সালাফ উপদেশ দিলেন, তুমি সালাতে দাড়াও। তারপর সে সালাতে দাঁড়ালে, সালাতের মধ্যে জায়গাটি তার স্মরণ আসল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি এটি কোথায়

শিখলে? তিনি বললেন, আমি জানি শয়তান কোনো মানুষকে সালাতে শান্তিতে থাকতে দেয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তাকে সালাতে মনোযোগ দেয়া হতে বিরত রাখে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যান্য আদিষ্ট কর্মগুলো পুরোপুরি সম্পাদনের সাথে সাথে সালাতেও পুরোপুরি মনোযোগী হতে সচেষ্ট থাকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, "মহান, সর্বোচ্চ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই, তেমনিভাবে ইবাদত করারও কোনো ক্ষমতা নেই।"[1]

১৫- সালাফে সালেহীনদের সালাতের অবস্থা কেমন ছিল, সে বিষয়ে চিন্তা করা:

সালাফে সালেহীনের সালাত বিষয়ে চিন্তা করা দ্বারা সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অনুসরণের দিক ধাবিত করে। তাদের কাউকে যখন সালাত আরম্ভ করতে দেখতে এবং তারা যখন মেহরাবে দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে গিয়ে তাদের রবের সাথে কথা বলতে শুরু করত, তখন তাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত হত যে, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ

[1] মাজমু' ফাতাওয়া: ২২/৬১০।

আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়, তাদের অন্তর খুলে যাওয়ার উপক্রম হতো এবং বিবেক-বুদ্ধি অবশ হয়ে যেতো”।[1]

আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেন, সালাফরা যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহকে এমন ভয় করতেন যে, যতক্ষণ সালাতে থাকতেন ততক্ষণ কোনো কিছুর প্রতি তাকাতে বা এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করতে, অথবা সালাতে পাথর সরাতে অথবা কোন কিছু অনর্থক কাজ করতে, অথবা মনের মধ্যে দুনিয়াবি কোন কিছু চিন্তা করা থেকে বিরত থাকতেন। তবে ভুলবশত কিছু সংঘটিত হলে, সেটি ভিন্ন কথা।[2]

আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তিনি বিনয়ে কাঠ হয়ে যেতেন। তিনি সেজদারত ছিলেন, এমন সময় কামানের একটি গোলা এসে তার কাপড়ের একাংশ ছিঁড়ে নিয়ে যায়, তিনি সালাতেই থাকলেন, মাথা উঠালেন না। মাসলামা ইবন বাশ্‌শার মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, তখন কিছু মানুষের উপর মসজিদের কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ল, লোকেরা সালাত ছেড়ে দিল, কিন্তু তিনি সালাতে রয়ে গেলেন, তার কোনো খবরই হলো না। সালাফদের বিষয়ে আমাদের নিকট আরও সংবাদ পৌঁছেছে যে, তাদের কাউকে দেখা যেত, যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন,

---

[1] আল্লামা ইবনে রজবের কিতাব, আল-খুশু ফিস সালাত, পৃ: ২২।

[2] তা‘যীমু কাদরিস সালাত: ১/১৮৮।

তখন তিনি পতিত কাপড়ের মত হয়ে যেতেন, অর্থাৎ কোনো প্রকার নড়া-চড়া থাকত না। আবার তাদের কেউ কেউ যখন সালাত আদায় শেষ করতেন, তখন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কারণে তার চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত। আবার কেউ কেউ এমন ছিল যে, তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তার ডানে বামে কে দাঁড়াল, তা চিনতে পারতেন না। কাউকে দেখা যেত, যখন সালাতের অজু করতেন, তখন তার চেহারার রং হলুদ হয়ে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কি ব্যাপার আমরা আপনাকে দেখি যখন সালাতের ওজু করেন, তখন আপনার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়? তখন তিনি বলেন, আমি জানি আমি এখন কার সামনে দাঁড়াব। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ যখন সালাতে উপস্থিত হতেন, তখন তার দেহে কম্পন দেখা যেত এবং চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার কি হয়েছে? তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমানত আদায়ের সময় এসেছে, যে আমানতকে আল্লাহ আসমান, যমীন ও পাহাড়কে গ্রহণ করার জন্য পেশ করলে, তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তারা ভয় করে, আর আমি তা গ্রহণ করেছি। সাঈদ আত-তানুখী রহ. যখন সালাত আদায় করা আরম্ভ করতেন, তখন তার চোখের পানি চেহারা দিয়ে দাড়ি পর্যন্ত গড়াত। কোন কোন তাবেঈ সম্পর্কে বর্ণিত, যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন, তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তিনি বলতেন, তোমরা কি জান

কার সামনে আমি দাঁড়াবো এবং কার সাথে কথা বলব? তোমাদের মধ্যে কে আছে, যার অন্তরে আল্লাহর জন্য এ ধরনের ভয় আছে?।[1]

লোকেরা আমের ইবন আব্দুল কাইসকে জিজ্ঞেস করে বলেন, আপনি কি সালাতে মনে মনে কথা বলেন? তখন তিনি বলেন, সালাত থেকে আর কোনো কিছু আমার কাছে কি প্রিয় আছে যাতে আমি কথা বলব? তারা বলল, আমরা সালাতে মনে মনে কথা বলি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাহলে জান্নাত ও তার হূর ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বল? তারা বলল, না, কিন্তু আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদ বিষয়ে মনে মনে কথা বলি। তখন তিনি বললেন, সালাতে দুনিয়া বিষয়ে কথা বলা হতে তীরের আঘাতে আমার দেহ রক্তাক্ত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

সা‘আদ ইবন মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ বলেন, আমার মধ্যে তিনটি চরিত্র এমন আছে, যদি আমি আমার সকল অবস্থায় এ রকম থাকতে পারতাম, তবে আমি হয়ে যেতাম আমার মত। যখন আমি সালাতে মগ্ন থাকি তখন সালাত ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমি চিন্তা করি না। আর যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[1] সালাহুল ইয়াকজান লি তারদিশ-শাইতান: আব্দুল আজিজ আস-সালমান: ২০০।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো হাদিস শুনি, তখন হাদিসটি সত্য হওয়ার বিষয়ে আমার মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকে না। আর যখন আমি কোনো জানাযায় উপস্থিত হই, তখন আর জানাযা কি বলে এবং জানাযা সম্পর্কে কি বলা হয় তাছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা বলি না।[1]

হাতেম রহ. বলেন, আমি (সালাতে) আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য দণ্ডায়মান হই, আল্লাহর ভয় নিয়ে চলি, নিয়ত সহকারে সালাতে প্রবেশ করি, বড়ত্ব সহকারে তাকবীর বলি, তারতীল ও তাফকীরের সাথে কিরাত পড়ি, বিনয়াবনত হয়ে রুকু করি, বিনয় ও দীনতার সাথে সেজদা করি, পরিপূর্ণভাবে তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসি। নিয়তের সাথে সালাম দেই এবং আল্লাহর জন্য নিষ্ঠা বা ইখলাসের সাথে সালাতকে শেষ করি। আর সালাত থেকে এ ভয় নিয়ে ফিরে যাই, না জানি আমার থেকে আমার সালাতকে কবুল করা না হয়। আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে এগুলোর হেফাযত করি।[2]

আবু বকর আস-সাবগী রহ. বলেন, আমি দু’জন ইমামকে পেয়েছি যাদের থেকে হাদিস শোনার তাওফীক আমার হয়নি। তারা হলেন, আবু হাতেম আর-রাযি রহ. ও মুহাম্মাদ ইবন নসর

---

[1] ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২২/৬০৫।

[2] আল-খুশু ফিস সালাত, ২৭-২৮।

আল-মারওয়াযি রহ.। তন্মধ্যে ইবনু নসর, তার চেয়ে সুন্দর সালাত আদায়কারী আর কাউকে আমি দেখি নি। তার সম্পর্কে আমাকে জানানো হলো যে, একটি ভোলতা তার কপালের উপর বসলে, তার চেহারার উপর রক্ত প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। কিন্তু তিনি একটুও নড়া-চড়া করলেন না। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব আল-আখরম থেকে বর্ণিত, আমি মুহাম্মদ ইবন নসর থেকে বেশি সুন্দর সালাত আদায়কারী আর কাউকে দেখি নি। মাছি তার কানের উপর বসত, কিন্তু তিনি তা তাড়াতেন না। আমরা তার সালাতে খুশু, সালাতের সৌন্দর্য ও ভীতি দেখে আশ্চর্য হতাম। তিনি সালাতে তার থুতনিকে তার বুকের উপর ঝুঁকিয়ে দিতেন, এভাবে তিনি হয়ে যেতেন যেন একটি খাড়া কাঠ।[1] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. যখন সালাতে দাখিল হতেন, তার দেহে কম্পন শুরু হত, ফলে তিনি ডানে-বামে ঝুঁকে পড়তেন।[2]

তাদের সালাত আর বর্তমানে আমাদের সালাতের অবস্থার তুলনা করে দেখুন, বর্তমানে আমাদের কেউ কেউ সালাতে একবার ঘড়ির দিকে তাকায়, আবার কেউ কাপড় ঠিক করে,

---

[1] তা'যীমু কাদরিস সালাত, ১/৫৮।

[2] আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফী মানাকিবিল মুজতাহিদ ইবন তাইমিয়্যাহ, লি মার'য়ী আল-কারামী, পৃ. ৮৩। দারুল গারবিল ইসলামী।

কেউ আবার নাক খোঁচায়, আবার কেউ কেউ আছে, সালাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ মিলায়, হয়ত টাকাও গোনে। কাউকে দেখা যায়, সে জায়নামাযের নকশীগুলো দেখতে থাকে মসজিদের দেয়াল বা ছাদে যে সব লেখা আছে, তা দেখতে থাকে। আবার দেখা যায় তার দু' পাশে কে কে দাঁড়ালো তা লক্ষ্য করতে থাকে।

চিন্তা করার বিষয়, তাদের কেউ যদি দুনিয়ার কোনো ক্ষমতাশীল ব্যক্তির সামনে দাঁড়াত, তাহলে কি তারা এ ধরনের কোন কাজ করার সাহস পেত? নিশ্চয় না।

১৬- সালাতে খুশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা:

তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে,

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما من امريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها ، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله»

"কোনো মুসলিম যখন কোনো ফরয সালাতে উপস্থিত হয় এবং সুন্দর করে ওজু করে এবং সুন্দর করে রুকু-সেজদা করে, তখন সেটা তার জন্য তার অতীতের গুনাহগুলোর কাফফারা

হিসেবে গণ্য করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহ না করে। আর এটি সব সময়ের জন্য”।[1]

- সালাতের সাওয়াব নির্ধারিত হয় বান্দার খুশু অনুযায়ী। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن العبد ليصلي الصلاة ما يُكتب له منها إلا عشرها ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها »

“নিশ্চয় বান্দা সালাত আদায় করে, অথচ তার সে সালাতের সাওয়াব তার জন্য লেখা হয়, শুধু এক দশমাংশ, এক নবমাংশ, এক অষ্টমাংশ, এক সপ্তমাংশ, এক ষষ্ঠাংশ, এক পঞ্চমাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ ও অর্ধেক”।[2]

- মুসল্লি সালাতের ততটুকু সাওয়াব পাবে, যতটুকু সে বুঝতে পারবে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها »

“তোমার সালাত হতে তুমি ততটুকু পাবে, যতটুকু তুমি বুঝতে পারবে”।

---

[1] মুসলিম, ১/২০৬।

[2] ইমাম আহমদ: ৪/৩২১। হাদিসটি আলবানী রহ. সহীহুল জামে‘ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদিস নং ১৬২৬।

- যখন কেউ পরিপূর্ণ খুশু ও ভালোভাবে সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহ ও পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن العبد إذا قام يصلي أُتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه»

“যখন কোন বান্দা সালাতে দাড়ায়, তখন তার সমস্ত গুনাহকে উপস্থিত করা হয় এবং গুনাহগুলো তার মাথা ও গাড়ের উপর রাখা হয়। তারপর যখন রুকু করে এবং সেজদা করে তখন তার গুনাহসমূহ ঝরে যায়”।[1] আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন, “অর্থাৎ যখন বান্দা কোনো একটি রুকন আদায় করে, তখন গুনাহের একটি রুকন ঝরে যায়। যখন সালাত পুরা করে, তখন গুনাহগুলোও পুরোপুরি ঝরে যায়। আর এটি এমন সালাত সম্পর্কে যে সালাতে একজন মুসল্লি সালাতের শর্ত, রুকু-সেজদা, আরকানসমূহ ও খুশু‘ তথা বিনয়াবতভাবে আদায় করে। যেমন বুঝা যায়, হাদিসে ‘আবদ’ ও ‘কিয়াম’ শব্দদ্বয় উল্লেখ করা দ্বারা। কারণ, এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, লোকটি যিনি সমস্ত

[1] বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ৩/১০। সহীহুল জামে‘তেও হাদিসটি বর্ণিত।

বাদশাহর বাদশাহ, তার সামনে দাঁড়িয়েছে একজন অপদস্ত গোলামের মত হয়ে।[1]

- সালাতে মনোযোগী ব্যক্তি যখন সালাত সম্পন্ন করেন, তখন তিনি মনে এক প্রকার স্বস্তি পান এবং তিনি যেন তার মাথা থেকে অনেকগুলো বোঝা নামিয়ে রাখছেন এ রকম অনুভূতি লাভ করেন। ফলে তার মধ্যে কর্ম চাঞ্চল্যটা আরাম ও প্রাণ ফিরে আসে। এমনকি সে আশা করতে থাকে যদি সালাত হতে বের না হত; কারণ, সালাত তার চোখের শীতলতা, তার আত্মার খোরাক, তার আত্মার বাগান ও দুনিয়াতে তার আরামের স্থান। সালাতের বাইরে সর্বদা সে যেন বন্দীশালা ও অস্বস্তির মধ্যে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আবার সালাতে ফিরে না যায়। ফলে সে সালাতে আরাম পায়, সালাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় না, (সালাতের বাহিরে তার কোন শান্তি নেই।) যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা বলেন, আমরা সালাত আদায় করি এবং সালাত দ্বারা আরাম পাই। যেমন, তাদের ইমাম ও অনুকরণীয় ব্যক্তি, তাদের নবী বলেন, «يا بلال أرحنا بالصلاة» হে বেলাল, আমাকে সালাতের

---

[1] বাইহাকী সুনানুল কুবরা ৩/১০।

মাধ্যমে শান্তি দাও। এ কথা বলেন নি যে, সালাত থেকে আমাকে শান্তি দাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, «جعلت قرة عيني بالصلاة» "আমার চোখের প্রশান্তি নির্ধারণ করা হয়েছে সালাতের দ্বারা"। যার চোখের শীতলতা ও আত্মার প্রশান্তি হল সালাত, তার চোখ কিভাবে সালাত ছাড়া প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং সে কীভাবে সালাত ছাড়া ধৈর্য ধারণ করতে পারে?[1]

১৭- সালাতের বিভিন্ন স্থানে অধিকহারে দো'আ করা, বিশেষ করে, সেজদার মধ্যে বেশি বেশি দো'আ করা।

নি:সন্দেহে বলা যায়, আল্লাহর সাথে কথোপকথন করা, আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ করা, আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং আল্লাহর কাছে বার বার ফিরে যাওয়া দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং বন্ধন হয় অটুট। ফলে সালাতে খুশু বৃদ্ধি পায়। আর দো'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এ ইবাদতটি করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ ۝٥٥﴾ [الاعراف: ٥٤]

---

[1] আল-ওয়াবিলুস-সাইয়্যেব: ৩৭।

“তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে।[1]”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من لم يسأل الله يغضب عليه»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট না চায়, আল্লাহ তার উপর ক্ষুব্ধ হন”।[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নির্দিষ্ট কিছু স্থানে দো‘আ করার বিষয়টি প্রমাণিত, যেমন, সেজদার মধ্যে দো‘আ করা, দুই সেজদার মাঝে দো‘আ করা, তাশাহ্হুদের পরে দো‘আ করা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দো‘আর স্থান হল, সেজদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»

“কোন বান্দা সর্বাধিক আল্লাহর নিকটে অবস্থান করে, যখন সে সেজদারত থাকে। অতএব, তোমরা সেজদায় বেশি বেশি দো‘আ কর”।[1]

---

[1] সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৪।

[2] তিরমিযি: দু’আ অধ্যায় ১/৪২৬। আলবানী সহীহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল, সেজদা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«...أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمَن - أي حريّ وجدير - أن يُستجاب لكم»

"সেজদায় তোমরা বেশি বেশি দো'আ কর। কেননা, অবশ্যই তা তোমাদের দো'আ কবুল করার সবচেয়ে উপযোগী"।[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় যে সব দো'আ পড়তেন, তার মধ্য হতে কয়েকটি দো'আ যেমন,

«اللَّهُمَّ اغفر لي ذنبي دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره»

"হে আল্লাহ আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, সূক্ষ্ম গুনাহ ও বড় গুনাহ, প্রথম গুনাহ ও শেষ গুনাহ এবং প্রকাশ্য গুনাহ এবং গোপন গুনাহ।[3]"

অনুরূপভাবে আরও বর্ণিত দো'আ,

---

[1] মুসলিম, সালাত অধ্যায়, রুকু-সেজদায় কি বলা হবে সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। হাদিস: ২১৫।

[2] বর্ণনায় মুসলিম, হাদিস: ২০৭, সালাত অধ্যায়। পরিচ্ছেদ: রুকু সেজদায় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে।

[3] মুসলিম, সালাত অধ্যায়; পরিচ্ছেদ: রুকু সেজদায় কি বলা হবে। হাদিস নং ২১৬।

«اللّٰهُمَّ اغفر لي ما أسررت وما أعلنت»

“হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন।[1]

আর দুই সেজদার মাঝখানে পঠিত দো‘আ খুশুর ১১ তম উপায় বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদের পর যে দো‘আ পড়তেন, তন্মধ্যে আমরা যা জেনেছি, তা হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্হুদ পড়া হতে ফারেগ হতেন, সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি বস্তু হতে আশ্রয় কামনা করে। জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, হায়াত ও মওতের ফিতনা হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে। তিনি আরও বলতেন,

«اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» «اللّٰهُمَّ حاسبني حسابا يسيرا»

“হে আল্লাহ! আমি আমার কর্ম যা আমি করেছি তার অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং আমি যা করিনি তার অনিষ্টতা থেকেও আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার থেকে সহজ হিসাব নিন”।

---

[1] নাসায়ী, হাদিস: ২/৫৬৯।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে, এ কথা বলতে শেখান-

«اللَّهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »

“হে আল্লাহ আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি আর আপনি ছাড়া কেউই আমার গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। **সুতরাং**, আপনি আপনার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি রহমত করুন। **নিশ্চয়** আপনিই ক্ষমাকারী ও দয়ালু”।

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনেন,

«اللَّهُمَّ إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم : قد غُفر له ، قد غُفر له»

“হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট চাই। হে আল্লাহ আপনি এক, কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং নিজেও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নি। আর কেউ তার সমকক্ষ নয়। হে আল্লাহ, আমি চাই যেন আপনি আমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিন, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এ কথগুলো শোনে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল।”

অপর এক ব্যক্তিকে তিনি তাশাহ্হুদে এ কথাগুলো বলতে শুনেন-

«اللَّهُمَّ إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار»

অর্থ, “হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। যাবতীয় প্রশংসা আপনারই। আপনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই। আপনি একক। আপনার কোন শরীক নেই। আপনি মান্নান, (দয়া প্রদর্শনকারী) হে আসমান ও যমিনের স্রষ্টা। হে ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী। হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসত্তার ধারক! আমি আপনার নিকট জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি”।

এ কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তোমরা কি জান লোকটি কি বলে দো‘আ করেছে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, লোকটি ইসমে আজম (মহৎ নাম) দ্বারা আল্লাহর কাছে চেয়েছে, যার দ্বারা দো‘আ করা হলে আল্লাহ

উত্তর দেন, আর তার দ্বারা কোন কিছু চাওয়া হলে, তিনি তা দান করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদ ও তাসলীমের শেষে যা বলতেন তা হচ্ছে,

« اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت »

“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা আমি পরবর্তীতে করেছি। আরও ক্ষমা করুন, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি গোপনে করেছি। আর যা সম্পর্কে আপনি আমার থেকে অধিক অবগত। আপনিই প্রথম এবং আপনিই শেষ। আপনি ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই।

এসব দো‘আ ও আরও অন্যান্য দো‘আ আল্লামা আলবানী রহ. এর সীফাতুস সালাত, পৃ: ১৬৩ কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। এ দো‘আগুলো মুখস্ত করার কারণে, ইমামের পিছনে চুপ করে বসে থাকার যে সমস্যা তার সমাধান হয়। অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, যদি সে তাশাহ্হুদ পড়া শেষ করে, সময় পায় তাহলে এ দো‘আগুলো পড়বে। কারণ, অনেক লোককে দেখা যায় সে চুপ করে বসে থাকে কি পড়বে তা জানে না।

১৮- সালাতের পর হাদিসে বর্ণিত দো'আ:

এ দো'আগুলো অন্তরে সালাতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি ও সালাত দ্বারা বরকত লাভ ও উপকার লাভে সাহায্য করে।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথম ইবাদতকে সংরক্ষণ করা ও তার হেফাযত করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সে ইবাদতের সাথে সাথে অন্য দ্বিতীয় কিছু ইবাদত করে নেওয়া। সালাতের পর যিকিরসমূহের মধ্যে চিন্তা করা দ্বারা বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝে আসবে। কারণ, সে প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবে; সালাত শেষ করার সাথে সাথে সালাতে তার যে সব দুর্বলতা- অমনোযোগীতা, খুশুহীনতা প্রকাশ পেয়েছে এবং সালাতে তার যে সব ভুলত্রুটি দেখা দিয়েছে, তার জন্য তিনবার এস্তেগফার পড়বে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নফল সালাত আদায় করবে, কারণ, নফল সালাত দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হয়ে থাকে এবং সালাতে খুশু না থাকার ক্ষতিপূরণ হয়ে থাকে।

সালাতের খুশু' বা বিনয়াবনত অবস্থা আনয়নকারী উপায়গুলোর কথা উল্লেখ করার পর, দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সব বিষয়ের আলোচনা করব, যে কর্মগুলো মানুষকে খুশু থেকে ফিরিয়ে রাখে, অন্য মনষ্ক করে এবং সুন্দর করে সালাত আদায় করা হতে বিরত রাখে।

দ্বিতীয় প্রকার: সালাতে খুশুর পথে বাধা হয়, প্রতিবন্ধক তৈরী করে, অথবা খুশু বিনষ্ট করে এমন যাবতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন,

১৯- যে সব বস্তু একজন মুসল্লির মনোযোগ নষ্ট করে, সালাতের স্থান থেকে সেগুলো দূর করা

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان قِرام (ستر فيه نقش وقيل ثوب ملوّن) لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أميطي - أزيلي - عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা' এর একটি পর্দা [যাতে নকশা ছিল বা রঙিন] ছিল, যার দ্বারা তিনি তাঁর ঘরের একপাশকে ঢেকে রাখতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, কাপড়টি সরিয়ে নাও। কারণ, এ কাপড়ের ছবিগুলো সব সময় আমার সালাতে ভেসে উঠে।[1]

হাদিস বর্ণনাকারী কাশেম রহ. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা' থেকে বর্ণনা করেন,

---

[1] বুখারি, ফতহুল বারী: ৩৯১/১০।

أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة (بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع أو الخزانة) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال : «أخّريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» فأخرته فجعلته وسائد.

“আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার একটি কাপড় ছিল, যা একটি ছোট ঘর (যা ঘর থেকে একটু নিচুতে ছিল অনেকটা স্টোর রুমের মত, সে) দিক ঝুলানো ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাপড়টি সরাও; কারণ, কাপড়টির ছবিগুলো সবসময় সালাতে আমার সামনে ভেসে উঠে। তারপর আমি কাপড়টি সরিয়ে ফেলি এবং তা দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানিয়ে নেই।[1]

বিষয়টির উপর প্রমাণ হিসেবে আরও একটি হাদিস পেশ করা যায়, তা হল,

لما دخل الكعبة ليصلي فيها رأى قرني كبش فلما صلى قال لعثمان الحجبي «إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي.»

---

[1] মুসলিম: হাদিস: ৩/১৬৬৮।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবা শরীফে সালাত আদায়ের জন্য প্রবেশ করেন, তিনি দুটি ভেড়ার শিং দেখেন। সালাত আদায় করার পর, তিনি ওসমান আল হাজাবীকে বলেন, আমি তোমাকে শিং দুটিকে ঢেকে রাখার কথা বলতে ভুলে গেছি। কারণ, কা‘বা ঘরের মধ্যে এমন কোনো জিনিষ থাকা উচিত নয় যা একজন মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখে”।[1]

উল্লেখিত বিষয়ের সাথে সাথে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ মানুষের চলাচলের স্থানে সালাত আদায়, মানুষের কোলাহল, চিল্লা-পাল্লা ও গোলযোগের স্থানে সালাত আদায়, কোন আলোচনার মজলিশের পাশে সালাত আদায় এবং যে সব স্থান খেলা-ধুলা ও হৈ-চৈ ইত্যাদি করা হয়, সেখানে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকা।

অনুরূপভাবে যদি সম্ভব হয়, যে সব স্থানে অধিক গরম বা অধিক ঠাণ্ডা জায়গার মধ্যে সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমের দিনে গরমের কারণে যোহরের সালাতকে ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, কঠিন গরমের সময় সালাত আদায় করা, একজন মানুষকে সালাতে খুশু ও মনোযোগী হওয়াতে বাধা দেয় এবং ইবাদতকে অপছন্দ ও ঘৃণিত বানায়। **এ**

---

[1] আবু দাউদ: হাদিস: ২০৩০ সহীহুল জামে‘: হাদিস: ২৫০৪।

কারণেই শরিয়তের বিধান দাতা বান্দাদের সালাতকে দেরীতে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে গরম কমে যায়। যাতে বান্দা মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করতে পারে এবং সালাত আদায়ে তার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ সালাতে মনোযোগী ও বিনয়ী হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি দাবিত হওয়া তা হাসিল হয়।[1]

২০- এমন কাপড়ে সালাত আদায় করবেন না, যাতে নকশা অথবা লেখা অথবা বিভিন্ন রঙ অথবা ছবি থাকে, যা একজন মুসল্লিকে সালাতে মনোযোগী হতে বিরত রাখে:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قام النبي الله صلى الله عليه و سلم يصلي في خميصة ذات أعلام - أي : كساء مخطط ومربّع - فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال : «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة و أتوني بأنبجانيّه - كساء ليس فيه تخطيط ولا تطريز ولا أعلام -، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নকশী বিশিষ্ট এক জামা পরিধান করে সালাত আদায় করতে দাঁড়ান। সালাতে জামার নকশার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। **সালাত শেষ করে** তিনি বলেন, তোমরা এ জামাটিকে আবু জাহাম ইবন হুযাইফাকে দাও এবং তার থেকে তার আম্বেজানিয়্যা অর্থাৎ এমন একটি জামা নিয়ে

[1] আল ওয়াবিলুস সাইব, দারুল বায়ান: পৃ: ২২।

আস যাতে কোন নকশা দাগ ও বুটা নেই। কারণ, এটি এখনই আমাকে আমার সালাতের মনোযোগ নষ্ট করে দিয়েছিল”। অপর বর্ণনায় এসেছে, شغلتني أعلام هذه এ কাপড়ের পাড় আমাকে আমার সালাত থেকে অমনোযোগী করেছে। **অপর এক বর্ণনায়** এসেছে, كانت له خميصة لها علم ، فكان يتشاغل بها في الصلاة "রাসূলের একটি চাদর ছিল, যাতে বিভিন্ন ধরনের নকশা ছিল, যা তাঁকে তার সালাতে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল।[1]

সুতরাং, যে সব কাপড়ে জীব-জন্তু বা কোনো প্রাণীর ছবি রয়েছে তাতে সালাত আদায় করা, যেমনটি বর্তমানে আমাদের সময়ে প্রচলিত রয়েছে, তা আরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

২১- খাওয়ার সামনে উপস্থিত হলে, তাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করবেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا صلاة بحضرة طعام»

“খানা হাজির থাকা অবস্থায় কোনো সালাত আদায় করা যাবে না”।[2]

---

[1] মুসলিম, হাদিস নং ৫৫৬; ১/৩৯১।

[2] মুসলিম, হাদিস নং ৫৬০।

যখন খানাকে সামনে রাখা হয় এবং খানা সামনে উপস্থিত থাকে অথবা তার সামনে খানাকে পেশ করা হল, তখন প্রথমে খানা খাওয়ার কাজটি সেরে নেবে। কারণ, যখন খানা খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং সালাতে দাঁড়ায় অথচ তার নফস খানার সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তখন সালাতে তার মনোযোগ নষ্ট হবে। বরং বান্দার উপর ওয়াজিব হল, তার প্রয়োজনসমূহ শেষ করে তার পর সালাতে দাঁড়াবে, তাড়াহুড়া করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إذا قرِّب العَشاء وحضرت الصلاة ، فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم.»

“যখন তোমাদের সামনে রাতের সালাত ও রাতের খাওয়ার উপস্থিত করা হয়, তখন তোমরা মাগরিবের সালাতের পূর্বে খাওয়ারের কাজ আগে সেরে নাও। তোমরা তোমাদের রাতের সালাত আদায়ে তাড়াহুড়া করো না”। অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

«إذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجلنّ حتى يفرغ منه»

“যখন তোমাদের রাতের খাওয়ার সামনে রাখা হয়, আর সালাতের একামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা রাতের খাওয়া দিয়ে

শুরু কর। খাওয়া শেষ করার পূর্বে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না”।[1]

২২- পেশাব ও পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত আদায় করবে না:

নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যখন পায়খানা ও পেশাবকে আটকে রেখে সালাত আদায় করে, তা সালাতে খুশুতে বিঘ্ন ঘটায়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা পেশাবের বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। হাদিসে বর্ণিত,

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবকে আটকে রেখে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেন”।[2]

সুতরাং কারো যদি পায়খানা বা পেশাবের বেগ হয়, তখন তার করণীয় হল, সে তার প্রয়োজন সেরে নেয়ার জন্য বাথরুমে

---

[1] বুখারি ও মুসলিম; বুখারি কিতাবুল আযান, পরিচ্ছেদ: যখন খানা উপস্থিত হয় এবং সালাতের একামত দেয়া হয় তখন করনীয় প্রসঙ্গে। মুসলিম: হাদিস নং ৫৫৯-৫৫৯।

[2] ইবনু মাজাহ্‌, হাদিস নং ৬১৭। সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৬৮৩২। হাকেন অর্থ, পায়খানার বেগ হলে পায়খানা না করে তা আটকে রাখা।

যাবে যদিও জামাতে সালাত আদায় ছুটে যায়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء».

"যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যেতে চায় এবং সালাতের একামত হয়, তখন সে প্রথমে পায়খানা সেরে নেবে"।[1]

বরং যখন এ ধরনের কোনো সমস্যা সালাতের মাঝখানে দেখা দেয়, তখন সে পায়খানা বা পেশাব করার জন্য সালাত ছেড়ে দেবে। তারপর অজু করবে এবং সালাত আদায় করবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»

"খাবারের উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই এবং পায়খানা ও পেশাবকে প্রতিহত করা অবস্থায় কোনো সালাত নেই"।[2] এ ধরনের প্রতিহত করা অবশ্যই সালাতের খুশু' খুজু বিনষ্ট করে। বায়ূ চেপে রাখাও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

---

[1] আবু দাউদ, হাদিস: ৮৮। সহীহুল জামে', হাদিস: ২৯৯।

[2] মুসলিম, হাদিস: ৫৬০।

২৩-যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন সালাত আদায় না করা:

আনাস ইবন মালেক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول»

“যখন তোমাদের কারো সালাতের মধ্যে তন্দ্রা আসে, সে যেন ঘুমিয়ে পড়ে; যতক্ষণ না সে কি বলে তা বুঝতে পারে। অর্থাৎ শুয়ে পড়বে, যাতে সালাতে ঘুমাতে না হয়”।[1]

এখানে কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا نعس أحدكم و هو يصلي فليرقد ، حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه».

যখন তোমাদের কারো সালাতে তন্দ্রা আসে, সে যেন শুয়ে পড়ে। যতক্ষণ না তার ঘুম দূর হয়ে যায়। কারণ, যখন তোমাদের কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সালাত আদায় করে, তখন সে কি বলবে, তা

---

[1] বুখারি, হাদিস: ২১০।

বুঝতে পারে না। হতে পারে সে ক্ষমা চাচ্ছে, কিন্তু সে নিজেকে গালি দিয়ে বসছে।[1]

এ ধরনের সমস্যা রাতের সালাত তথা তাহাজ্জুদের মধ্যেও হতে পারে, আর দেখা গেল দো'আ কবুল হওয়ার সময়, না জেনে সে তার নিজেরই বিরুদ্ধে দো'আ করে বসল। আর যখন ঘুমানোর পরে সালাত আদায় করার পর্যাপ্ত সময় থাকে, তখন এ হাদিস ফরয সালাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে।[2]

২৪- কথা বলায় মগ্ন বা ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না

কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পিছনে সালাত আদায় হতে নিষেধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করে বলেন,

«لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث»

---

[1] বুখারি হাদিস নং ২০৯।

[2] ফতহুল বারী, কিতাবুল ওজুর ব্যাখ্যা, পরিচ্ছেদ: ঘুম হতে জেগে ওজু করা বিষয়ে আলোচনা।

অর্থাৎ ফরয সালাতেও যদি কারও ঘুম বা তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন ঘুমিয়ে নেয়, তবে তা হবে পর্যাপ্ত সময় অবশিষ্ট থাকা অবস্থায়। নতুবা ঘুম তাড়িয়ে ফরয সালাত সময়মত আদায় করতে হবে। [সম্পাদক]

“তোমরা কথায় মগ্ন ব্যক্তি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করো না।[1]”

কারণ, কথায় মগ্ন ব্যক্তি তার কথা দ্বারা সালাত আদায়কারীকে অমনোযোগী করে দিবে, আর ঘুমন্ত ব্যক্তি দ্বারা এমন কিছু প্রকাশ পায় যা সালাতে বিঘ্ন ঘটায়।

আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. কথায় মগ্ন লোকদের সামনে রেখে সালাত আদায়কে অপছন্দ করেন। কারণ, তাদের কথা একজন মুসল্লিকে তার সালাত থেকে বিরত রাখতে পারে।[2]

ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে প্রমাণগুলোকে কতক আহলে ইলম দুর্বল আখ্যায়িত করেন। তাদের মধ্যে একজন ইমাম আবু দাউদ; তিনি তার সুনানে আবু দাউদে সালাত অধ্যায়, বিতরের সালাত পরিচ্ছেদ ও দো‘আ পরিচ্ছেদে বিষয়টি উল্লেখ করেন।[3] অনুরূপভাবে ইবন হাজার রহ. তার ফাতহুল বারীর শারহু বাবিস সালাত খালফান নায়েম, কিতাবুস সালাত।

---

[1] আবু দাউদ, হাদিস:৬৯৪; সহীহুল জামে‘ হাদিস ৩৭৫। তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান।

[2] ‘আওনুল মাবুদ: ২/৩৮৮।

[3] দেখুন, ফতহুল বারী, সালাত অধ্যায়।

ইমাম বুখারি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় পরিচ্ছেদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদিস বর্ণনা করেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه..

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানায় শুয়ে থাকতাম, আর তিনি সালাত আদায় করতেন।[1]

মুসল্লিকে সালাতে মনোযোগ দেয়া থেকে বিরত রাখে এমন কোনো বিষয় প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তখনই কেবল মুজাহিদ, তাউস ও ইমাম মালেক ঘুমন্ত ব্যক্তির দিকে সালাত আদায়কে মাকরূহ বলেছেন।[2]

আর যদি এ ধরনের কোনো বিষয় প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় মাকরূহ হবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[1] বুখারি, সালাত অধ্যায়।

[2] দেখুন, ফতহুল বারী, উল্লেখিত সূত্র।

২৫- পাথর সরানো [অনুরূপভাবে জায়নামায ঠিক করার] কাজে ব্যস্ত না হওয়া

ইমাম বুখারি রহ. মু'আইকিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু' থেকে বর্ণনা করেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : «إن كنت فاعلا فواحدة»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদার জায়গায় পাথর পরিষ্কার করছে, এমন এক ব্যক্তিকে বলেন, যদি এ কাজটি করতেই হয়, তবে একবার কর"।[1]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تمسَح وأنت تصلي فإن كنتَ لا بدَّ فاعِلا فواحدة»

"তুমি সালাতরত অবস্থায় পাথর স্পর্শ করবে না। আর যদি করতেই চাও তবে একবার করবে"।[2]

হাদিসে নিষেধ করার কারণ, সালাতের খুশু ও বিনায়বণত অবস্থার হেফাযত করা, আর যাতে তা দ্বারা 'আমলে কাসীর' বা অতিরিক্ত কাজ না হয়। সেজদার স্থান যদি সমান করার প্রয়োজন

---

[1] দেখুন ফতহুল বারী, হাদিস: ৭৯/৩।

[2] আবু দাউদ, হাদিস: ৯৪৬; সহীহুল জামে', হাদিস: ৭৪৫২।

পড়ে তবে সালাত আরম্ভ করার পূর্বেই সেটি সমান করে নেয়া উত্তম।

অনুরূপভাবে সালাতের মধ্যে কপাল পরিষ্কার করা, নাক পরিষ্কার করা, ইত্যাদি উল্লেখিত হাদিসের আওতায় পড়বে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটি ও পানির মধ্যে সেজদা করেন এবং কপালে তার দাগ পড়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতবার সেজদা থেকে উঠতেন ততবার তিনি কপাল পরিষ্কার করতেন না। কারণ, সালাতে মগ্ন থাকা ও মনোযোগী হওয়া কপালের ময়লা পরিষ্কার করাকে ভুলিয়ে দেয় এবং এ ধরণের কাজ থেকে বিরত রাখে। **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন**,

«إن في الصلاة شغلا»

“নিশ্চয় সালাতে রয়েছে ব্যস্ততা।”[1]

ইবনু আবি শাইবা রহ. আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى

[1] বুখারি ৩/৭২।

“আমি আমার সেজদার জায়গা থেকে পাথর পরিষ্কার করাকে আমার জন্য লাল উটের বিনিময়ে হলেও পছন্দ করি না।” আল্লামা কাযী আয়াদ্ব রহ. বলেন, ‘সালাতে কপাল পরিষ্কার করাকে সালাফে সালেহীনগণ মাকরূহ বলেছেন’।[1] অর্থাৎ সালাত শেষ করার পূর্বে।

যেমনিভাবে সালাতে মনোযোগ নষ্ট করে, এমন সব বিষয় যেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি তা হতে মুসল্লিকে বিরত থাকতে হবে, তেমনিভাবে অপর মুসল্লির সালাতে বিঘ্ন হয় ও তার মনোযোগ নষ্ট করে, এমন কোনো কাজ না করা একজন মুসল্লির দায়িত্ব ও কর্তব্য। তন্মধ্যে রয়েছে:

২৬- কিরাত বা সূরা পড়তে গিয়ে অন্যদের সালাতে ডিস্টার্ব করবে না:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ألا إن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»

“সাবধান! তোমাদের সবাই আল্লাহর সাথে কথোপকথন করছ। তোমরা একে অপরকে কষ্ট দেবে না। তোমরা কিরাতে (অথবা

---

[1] দেখুন, ফতহুল বারী, নং ৩/৭৯।

বলেন, সালাতে) একে অপরের কিরাতের উপর নিজের আওয়াজকে উঁচু করবে না”।[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»

“তোমাদের কেউ যেন অপর কারও উপর কুরআনের শব্দকে উচ্চ না করে”[2]।

২৭-সালাতে এদিক সেদিক তাকানো ছেড়ে দেয়া:

আবু যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه »

“যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা সালাতে এদিক সেদিক তাকাবে না, আল্লাহ তা‘আলা সে বান্দার দিক চেয়ে থাকেন। অতঃপর যখন সে এদিক সেদিক তাকায় তখন আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন”।[3]

---

[1] আবু দাউদ, হাদিস ২/৮৩; সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৭৫২ ।

[2] ইমাম আহমদ: ২/৩৬। সহীহুল জামে‘: ১৯৫১।

[3] আবু দাউদ: ৯০৯ সহীহ আবু দাউদ।

সালাতে এদিক সেদিক তাকানো দুই ধরনের হয়ে থাকে।

এক. অন্তরকে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে মনোনিবেশ করা।

দুই. চোখের দ্বারা এদিক সেদিক তাকানো। উভয় প্রকারের তাকানোই নিষিদ্ধ এবং এতে সালাতের সাওয়াব কমে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন,

«اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»

এটি একটি ছিনতাই, শয়তান বান্দার সালাত থেকে তা ছিনতাই করে নিয়ে যায়।[1] যে ব্যক্তি স্বীয় সালাতে চোখ দিয়ে ও অন্তর দিয়ে এদিক সেদিক তাকায় তার দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যাকে বাদশাহ তার দরবারে ডাকলে সে বাদশাহর ডাকে সাড়া দেয় এবং বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়। আর যখন বাদশাহ তার সাথে কথা বলছে এবং তাকে সম্বোধন করছে, তখন সে বাদশাহর কথা না শোনে ডান ও বাম দিক তাকায়। বাদশাহর কথার প্রতি কোন মনোযোগ না দেয়াতে সে বাদশাহ কি বলছে, তা বুঝতে পারছে না। কারণ, তার অন্তর উপস্থিত নেই। এ ধরনের লোকের

---

[1] বুখারি: কিতাবুল আযান, পরিচ্ছে: সালাতে এদিক সেদিক তাকানো প্রসঙ্গে আলোচনা।

সাথে বাদশাহর কি আচরণ করবে বলে তোমার ধারণা? এ ব্যক্তির ভাগ্যে এটিই হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহর দরবার হতে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ নিয়ে ফিরে যাবে এবং আল্লাহর দৃষ্টি হতে সে দূরে সরে যাবে। এ ধরনের মুসল্লি কখনও সে মুসল্লির সমান হবে না, যে ব্যক্তি সালাতে আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে পেশকারী, যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বকে অনুভব করে, যার সামনে দাঁড়াল তার প্রতি সজাগ থাকে, যার ফলে তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভরে যায় এবং আল্লাহর জন্য তার মাথা ঝুঁকে পড়ে; আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দেয়া বা কোনো দিকে তাকানো থেকে লজ্জা করে। তাদের উভয়ের সালাত এক রকম হতে পারে না। তাদের উভয়ের সালাতের মধ্যে তেমন পার্থক্য যেমনটি বলেছেন হাস্সান ইবন আতিইয়া, "দুই ব্যক্তি একই সালাত আদায় করছে, অথচ তাদের উভয়ের সালাতের মধ্যে ব্যবধান, আসমান ও জমিনের মধ্যের ব্যবধানের সমান। কারণ, তাদের একজন অন্তর দিয়ে আল্লাহর সমীপে নিজেকে পেশ করেছে, আর অপর ব্যক্তি অমনোযোগী ও গাফেল।[1]"

তবে প্রয়োজনের সময়, 'তাকানো'তে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আবু দাউদ সাহাল ইবনুল হানযালিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

[1] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেমের আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যেব, পৃ: ৩৬।

(ثُوِّبَ بالصلاة - صلاة الصبح - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب).

"সালাতের ঘোষণা দেওয়া হলো, অর্থাৎ ফজরের সালাতের ঘোষণা দেয়া হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি পাহাড়ের চুড়ার দিকে তাকাচ্ছিলেন"। ইমাম আবু দাউদ বলেন, (وكان أرسل فارسا من الليل إلى الشعب يحرس) "রাতে তিনি অশ্বারোহীকে পাহাড়ের চুড়ায় পাহারা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন"। (অর্থাৎ তিনি সেটার অবস্থা জানার জন্যই তাকাচ্ছিলেন)। আর অনুরূপ হচ্ছে, উমামা বিনতে আবিল আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে সালাতে বহন করা, 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার জন্য সালাত-রত অবস্থায় দরজা খোলা, মিম্বার থেকে নেমে নেমে সাহাবীদের সালাত শিক্ষা দেয়া, সালাতুল কুসুফে আগে পিছে যাওয়া, শয়তানকে বেধে রাখা ও তার গলা চেপে ধরা যখন সে সালাত ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে, সালাতে সাপ ও বিচ্ছুকে হত্যা করা, সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে প্রতিহত করা ও তার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া এবং নারীদেরকে সালাতের মধ্যে হাতের তালি দেয়ার নির্দেশ প্রদান এবং সালাতের মধ্যে কোনো প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত প্রদান করা, ইত্যাদি কাজগুলো, যা প্রয়োজনের সময় করার অনুমতি রয়েছে। আর যদি বিনা প্রয়োজনে সালাতে এ ধরনের কোন কাজ করা

হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে সালাতে অনর্থক ও নিষিদ্ধ কর্ম করা যেগুলো সালাতের মনোযোগকে নষ্ট করে এবং খুশর পরিপন্থী হয়।[1]

২৮- আকাশের দিক তাকানো হতে বিরত থাকা:

হাদিসে আকাশের দিক তাকানো হতে নিষেধ করেছেন এবং যারা সালাতে আকাশের দিক তাকায় তাদের হুমকি দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء ، أن يلتمع بصره »

"যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে থাকে, সে যেন আকাশের দিক না তাকায়; যাতে তার চোখের আরো ছিনিয়ে নেওয়া না হয়।"[2] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم»

"তাদের কি হয়েছে, যারা সালাতে তাদের চোখকে আকাশের দিক উঠায়?" অপর এক বর্ণনায়, "সালাতে দো'আ করার সময় তাদের চক্ষুকে আসমানের দিক উঠানো হতে নিষেধ

---

[1] মাজমু' ফাতাওয়া: ২২/৫৫৯।

[2] আহমদ: ২৯৪/৫। সহীহুল জামে', হাদিস: ৭৬২।

করা হয়”।[1] এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত কঠিন হুমকি দেন, এমনকি তিনি বলেন,

«لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»

“তারা হয়, আকাশের দিক তাকানো থেকে বিরত থাকবে, না হয় তাদের চোখ ছিনিয়ে নেওয়া হবে”।[2]

২৯- সালাতের মধ্যে মুসল্লি তার সামনে থু থু ফেলবে না:

কারণ, তা সালাতে খুশুর পরিপন্থী এবং আল্লাহর সাথে বেআদবি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِبَل وجهه فإن الله قِبَل وجهه إذا صلى».

“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, সে যেন তার সামনের দিকে থুতু না ফেলে। কারণ, যখন কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করে, তখন আল্লাহ তার চেহারার দিকেই থাকেন”।[3]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

---

[1] মুসলিম, হাদিস: ৪২৯।

[2] ইমাম আহমদ: ২৫৮/৫; সহীহুল জামে‘: ৫৫৭৪।

[3] বুখারি, হাদিস: ৩৯৭।

«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه ، فإنما يناجي الله - تبارك و تعالى - ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، و ليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه فيدفنها»

"যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে, সে যেন সামনে থুতু না ফেলে। কারণ, সে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে কথা বলতে থাকে। আর ডান দিকেও থুতু ফেলবে না কারণ, তার ডান দিকে একজন ফেরেশতা থাকে। যদি থুতু ফেলতে হয়, তবে বাম দিকে ফেলবে অথবা পায়ের নিচে ফেলবে, অতঃপর তা পুতে রাখবে"।[1]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ»

"যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে, সে যেন সামনে থুতু না ফেলে। আর নিশ্চয় তার রব থাকেন তার মাঝে ও তার কিবলার মাঝে। আর তোমাদের কেউ যেন, স্বীয় কিবলার দিক থুতু না ফেলে। তবে যদি ফেলতে হয়, সে যেন বাম দিক বা তার দু' পায়ের নিচে ফেলে।"[2]

---

[1] বুখারি, হাদিস নং ৪১৭, ৫১৩।

[2] বুখারী, নং ১৪১৭/৫১৩। ফাতহুল বারী।

আর যদি বর্তমান যুগের মত মসজিদে জায়নামায ইত্যাদি বিছানো থাকে, তখন যদি থুতু ফেলার প্রয়োজন পড়ে, পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে, তাতে থুতু ফেলে তা আবার পকেটে রেখে দেবে।

৩০- সালাতের মধ্যে হাইকে ধমিয়ে রাখতে চেষ্টা করা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا تثاءَب أحدُكم في الصلاة فليكظِم ما استطاع فإن الشيطان يدخل».

“যখন সালাতে তোমাদের কারো হাই আসে তখন তা যথা সম্ভব প্রতিহত করবে। কারণ, তাতে শয়তান প্রবেশ করে।[1]” যখন শয়তান মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন মুসল্লির সালাতে বিঘ্ন ঘটাতে শয়তান আরও বেশি সক্ষম হয়। এ ছাড়াও যখন মুসল্লি হাই দেয় তখন শয়তান হাসে।

৩১-সালাত আদায়ের সময় কোমরে হাত রাখা থেকে বিরত থাকা:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة)

[1] মুসলিম, হাদিস ৪/২২৯৩।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা থেকে নিষেধ করেন”।[1] আর হাদিস উল্লেখিত ‘আল-ইখতিছার’ শব্দের অর্থ, দু হাত কোমরে রাখা।

যিয়াদ ইবন সাবিহ আল-হানাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فضرب يدي فلما صلى قال هذا الصّلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه

“আমি ইবনে ওমরের পাশে সালাত আদায় করি, আমি আমার হাতদ্বয় কোমরে রাখলে তিনি আমার হাতের উপর প্রহার করেন। **যখন সালাত আদায় শেষ হল**, তখন বললেন, এটি সালাতের মধ্যে এক প্রকার শূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে আমাদের নিষেধ করতেন”।[2]

অপর একটি মারফু হাদিসে বর্ণিত, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[1] আবুদাউদ, হাদিস: ৯৪৭। সহীহ বুখারিতে সালাতে কর্ম করা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সালাতে কোমরে হাত দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা।

[2] ইমাম আহমদ ১/১০৬ ও অন্যান্যরা। হাফেয ইরাকী তাখরীজুল এহইয়া কিতাবে, হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। দেখুন, আল-ইরওয়া: ৪/৯৪।

«أن التخصّر راحة أهل النار»

"কোমরে হাত রাখা জাহান্নামীদের প্রশান্তি"। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে ইমাম বাইহাকী তা বর্ণনা করেন। আল্লামা ইরাকী রহ. বলেন, হাদিসটির সনদের প্রকাশ্য কথা হচ্ছে বিশুদ্ধ হওয়া।

৩২- সালাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়াকে পরিহার করা

কারণ, হাদিসে বর্ণিত,

(نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه).

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে সদল তথা মাথার উপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া ও মুখ ঢেকে রাখা হতে নিষেধ করেন।[1] আউনুল মাবুদ গ্রন্থকার বলেন, আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেছেন, "সদল বলতে বুঝায়, কাপড়কে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া যাতে মাটির সাথে গড়ায়[2]।" মিরকাতুল মাফাতীহ কিতাবে উদ্ধৃত[3] যে, 'সদল' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, এটি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। **আর সালাতের মধ্যে সদল করা**

---

[1] আবু দাউদ, হাদিস নং ৬৪৩। সহীহুল জামে', হাদিস: ৬৮৮৩; এবং বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

[2] ২/৩৪৭।

[3] মিরকাতুল মাফাতিহ কিতাবের ২/২৩৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত, সদল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

আরও বেশি মারাত্মক ও নিন্দনীয়। আর নিহায়ার প্রণেতা বলেন, দুই কাপড় দিয়ে মুড়ি দিয়ে হাত দ্বয়কে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে রুকু করা ও সেজদা করাকে ‘সদল’ বলে। কেউ কেউ বলেন, এ ধরনের কাজ ইয়াহূদীরা করত। আর কেউ কেউ বলেন, ‘সদল’ হল, কাপড়কে মাথা অথবা কাঁধের উপর রাখা এবং সামনের দিকে বা বুকের উপর ছেড়ে দেওয়া; ফলে মুসল্লি সালাতের মধ্যে কাপড় যাতে না পড়ে সে জন্য কাপড় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় যা সালাতে খুশু‘ অবলম্বনে বিঘ্ন ঘটায় এবং খুশুর পরিপন্থী হয়। তবে যদি কাপড় বাঁধা থাকে বা বোতাম লাগানো থাকে, যাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তখন সেটা মুসল্লিকে ব্যস্ত রাখে না, ফলে তা খুশুরও বিপরীত হয় না। বর্তমানে কিছু আফ্রিকান ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের পোশাক ও তাদের পরিধেয় আমরা দেখতে পাই, তারা সালাতের মধ্যে তাদের কাপড় ঠিক করাতেই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকে। দেখা যায় যদি পড়ে যায় তা উঠায় আবার ছুটে গেলে তার মিলায় ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।

আর মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করার কারণ সম্পর্কে আলেমগণ বলেন, এতে সুন্দরভাবে কিরাতকে পরিপূর্ণ করা হতে নিষেধ করে এবং পরি পূর্ণরূপে সেজদা করতে বিরত রাখে।[1]

---

[1] দেখুন: মিরকাতুল মাফাতিহ: ২/২৩৬।

৩৩- চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হতে বিরত থাকা

আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে বিশেষ সম্মান দেন এবং তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। সুতরাং একজন মানুষ স্বীয় আকৃতি বাদ দিয়ে কোন জন্তুর আকৃতি ধারণ করা খুবই অন্যায়। আমাদেরকে সালাতে জন্তুর আকৃতি ধারণ করা ও তাদের মত উঠ-বস করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। **কারণ**, এটি সালাতের মনোযোগী ও খুশু অবলম্বনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী; অথবা (নিষেধ করার কারণ হচ্ছে,) খারাপ আকৃতি ধারণ একজন মুসল্লির জন্য কখনো সমীচীন নয়। যেমন হাদিসে এসেছে,

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث : عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে তিনটি জিনিষ থেকে নিষেধ করেন। কাকের ঠোকর, হিংস্র জন্তুর বসা ও উটের মত একজন ব্যক্তি কোনো একটি জায়গাকে নিজের জন্য নির্ধারণ করা"।[1] অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মসজিদের কোনো একটি বিশেষ স্থানকে সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করা। যেমন, উট, সে তার বসার জায়গাকে পরিবর্তন করে না; বরং

[1] আহমদ: ৩/৪২৮।

একই স্থানকে নির্ধারণ করে থাকে।[1] অপর এক বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন,

(نهاني عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.)

“আমাকে নিষেধ করেছেন, মোরগের ঠোকরের মত ঠোকর দেয়া হতে, কুকুরের বসার মত পা তুলে বসা হতে এবং শিয়ালের মত এদিক সেদিক তাকানো হতে”।[2]

এ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে তা ছিল ঐ সব উপায়-উপকরণ, যেগুলো সালাতে খুশু আনয়ন করে, যাতে খুশু অর্জন করা সহজ হয় এবং ঐ সব কারণ যেগুলো সালাতে মনোযোগ ও খুশু নষ্ট করে, যাতে সেগুলো হতে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

আলেমদের নিকট খুশুর মাসআলাটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া ও মর্যাদা অনেক বেশি হওয়ার কারণে তারা নিচে উল্লেখিত বিষয়টি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

---

[1] দেখুন, ফতহুর রাব্বানী ৪/৯১।

[2] ইমাম আহমাদ: ২/৩১১। সহীহ আত-তারগীব: হাদিস: ৫৫৬।

মাসআলা: কোন ব্যক্তির সালাতে বেশি ওয়াস-ওয়াসা পরিলক্ষিত হলে, তার সালাত সহীহ হবে ? নাকি তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে?

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন:

যদি বলা হয়, যার সালাতে খুশু উপস্থিত না থাকে তার সালাত সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি, তার সালাতকে বিশুদ্ধ ধরা হবে নাকি ধরা হবে না।

উত্তরে বলা হবে, সাওয়াবের ক্ষেত্রে ধরা হবে না। ততটুকু ধরা হবে, যতটুকু সে বুঝতে পারে এবং আল্লাহর স্মরণ করে।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها তোমার সালাত হতে ততটুকুরই তুমি হকদার, যতটুকু সালাত তুমি মনোযোগ দিয়ে আদায় করছ।

মুসনাদে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن العبد ليصلي الصلاة، ولم يكتب له إلا نصفها، أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها.»

“নিশ্চয় বান্দা সালাত আদায় করে, তার সালাতের পুরো সাওয়াব পায় না বরং অর্ধেক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ পায় অথবা এক চতুর্থাংশ পায়, এভাবে রাসূল বলতে বলতে এক দশমাংশ পর্যন্ত বললেন।”

আল্লাহ তা‘আলা মুসল্লিদের সফলতা পাওয়াকে তাদের সালাতের মধ্যে খুশু থাকার সাথে সম্পৃক্ত করেন। এতে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি সালাতে খুশু অবলম্বন করে না, সে সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি সালাতে খুশু না থাকাতে পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যেত, তাহলে মুসল্লি সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। আর দুনিয়াবি বিধান অনুযায়ী যদি সালাতের অধিকাংশ সময়ে খুশু থাকে এবং অধিকাংশ সালাতকে বুঝতে পারে, সকলের ঐক্য মতের ভিত্তিতে তখন সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ ধরনের সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে সুন্নাত হল, সালাতের পরে হাদিসে বর্ণিত সুন্নাত ও যিকিরগুলো পড়া, যাতে তাদের সালাতের দুর্বলতা পূর্ণতা পায় ও ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

আর যদি সালাতের অধিকাংশ সময় খুশু না থাকে এবং মনোযোগ না থাকে, তাহলে তার সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হওয়া বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমদের অনুসারী আল্লামা ইবনে হামেদ রহ. এর মতে এ ধরনের সালাতকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। তাছাড়া

সালাতের খুশুর বিধান সম্পর্কেও ফকীহগণের মধ্যে দুই রকম কথা পাওয়া যায়। আর দুটি মতই আহমদ ও তার অনুসারীদের মত।

দুটি মতামত অনুযায়ী, যদি কারো সালাতে ওয়াসওয়াসা প্রাধান্য পায়, তাহলে তার সালাত পুনরায় পড়তে হবে কিনা এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. এর অনুসারী আল্লামা ইবনে হামেদ রহ. সালাত পুনরায় আদায় করাকে ওয়াজিব বলেন। তবে অধিকাংশ ফকীহগণের মতে পুনরায় সালাত আদায় করা ওয়াজিব নয়।

তারা দলীল দেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে দুটি সাহু সেজদা করা নির্দেশ দেন, কিন্তু সালাত পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেন নি। রাসূল আরও বলেছিলেন,

«إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول : أذكر كذا ، أذكر كذا ، لما لم يكن يذكر ، حتى يُضل الرجل أن يدري كم صلى»

“শয়তান তোমাদের সালাতে উপস্থিত হয়ে তাকে বলে, তুমি এ কথা স্মরণ কর, তুমি এ কথা স্মরণ কর, যে বিষয়গুলো সে ভুলে গিয়েছিল সেগুলো সে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে লোকটি কত রাকাত সালাত পড়ল তা ভুলে যায়।”

তবে এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, এ ধরনের সালাতে কোন সাওয়াব নেই; শুধু ততটুকু সাওয়াব পাবে যতটুকুর মধ্যে মুসল্লির অন্তর উপস্থিত থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ، ثلثها ، ربعها ، حتى بلغ عشرها»

“নিশ্চয় বান্দা সালাত আদায় করে, তার সালাতের পুরো সাওয়াব পায় না বরং অর্ধেক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ পায় অথবা এক চতুর্থাংশ পায়, এভাবে রাসূল বলতে বলতে এক দশমাংশ পর্যন্ত বললেন।”

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ বলেন,

«ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»

“তুমি তোমার সালাত থেকে ততটুকুই পাবে, শুধু যতটুকু সালাতে তুমি মনোযোগী ছিলে।” যদিও এ ধরনের সালাতকে এ অর্থে শুদ্ধ বলা যায়, যে শরিয়ত এ ধরনের সালাত পুনরায় পড়তে বলে নি, কিন্তু সালাতের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এ সালাতকে শুদ্ধ বলা যায় না।[1]

---

[1] মাদারেজুস সালেকীন ১/১১২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط ، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل ، فإذا ثوب بالصلاة أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبل ، حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا اذكر كذا ، ما لم يكن يذكر ، حتى يظل لا يدري كم صلى ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس»

“যখন মুয়াজ্জিন সালাতের আযান দেয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আযানের আওয়াজ শোনা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে দৌড়াতে থাকে। আর যখন আযান দেয়া শেষ হয়, তখন শয়তান ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের একামত দেয়া হয়, তখন সে আবার পলায়ন করে। যখন একামত দেয়া শেষ হয়, তখন আবার ফিরে আসে এবং মানুষের অন্তরে বিভিন্ন ধরনের কু-মন্ত্রণা দেয়। তখন শয়তান মুসল্লিকে বল, এটি স্মরণ কর, এটি স্মরণ কর, তার ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো শয়তান তাকে তার সালাতের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে সে বুঝতে পারে না যে, কত রাকাত সালাত সে আদায় করল। তোমাদের কারো সালাতে এ ধরনের এ সমস্যা দেখা দিলে, তোমরা বসা অবস্থায় দুটি সেজদা সাহু করে নেবে”। ফকীহগণ বলেন, এটি এমন একটি সালাত, যাতে শয়তান সালাত

আদায়কারীকে সালাত হতে গাফেল বানিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা সাহু করার নির্দেশ দেন, সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেন নি। যদি সালাত বাতিল হত, যেমনটি তোমরা মনে করছ, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতকে পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিতেন।

তারা আরও বলেন: এটি হল, সেজদা সাহু দেয়ার আসল রহস্য বা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শয়তান বান্দাকে সালাতে ওয়াস-ওয়াসা দেয়া ও একজন বান্দা সালাতে মনোযোগী হওয়া বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার কারণে তাকে সেজদা সাহুর মাধ্যমে অপমান-অপদস্ত করা। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা সাহুকে 'মুরগামাতাইন' বা নাকে খত প্রদানকারী বলে নামকরণ করেন।

আর যদি সালাত পুনরায় আদায় করা দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য এ সব ফলাফল ও উপকার লাভ করা, তাহলে এটা জানা আবশ্যক যে এ সবই বান্দার উপর সোপর্দ। সে যদি চায় তা লাভ করতে পারবে, আর যদি চায় ছেড়ে দিতে পারবে।

আর যদি ওয়াজিব হওয়া দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, আমরা তাকে তা করতে বাধ্য করব এবং সালাতে খুশু ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাকে আমরা শাস্তি দেব এবং তার উপর সালাত

ত্যাগকারীর বিধান চালু করব, তাহলে আমরা তোমাদের সাথে নেই। এ ধরনে কাজকে আমরা প্রশ্রয় দেই না। এটিই হল, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। আল্লাহই ভালো জানেন।

পরিশিষ্ট

সালাতে খুশুর বিষয় কোন ছোট-খাটো বিষয় নয়। এটি একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং খুশুর বিষয়টি খুবই ভয়ানক ও বিপদজনক। এটি তার ভাগ্যে জুটে যাকে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দেয়। আর সালাতে খুশু অনুপস্থিত থাকা, বড় বিপদ ও মারাত্মক খারাপ কাজ। **এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** দো'আতে বলতেন,

«اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع..»

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন অন্তর থেকে আশ্রয় কামনা করি, যাতে খুশু নেই।"[1]

সালাতে খুশু অবলম্বনকারীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আর খুশু হল, মানুষের আত্মার কাজ। সালাতে খুশু কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে। অনেক মানুষ আছে যাদের খুশু আসমান পর্যন্ত পৌঁছে, আবার কতক লোক আছে যারা তাদের সালাত হতে বের হয় তারা কিছুই বলতে পারে না। আর সালাতের মধ্যে মানুষ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত:

---

[1] তিরমিযি, হাদিস ৫/৪৮৫। সহীহ সুনানে তিরমিযি: হাদিস নং ২৭৬৯।

এক- ঐ ব্যক্তি, যে তার স্বীয় আত্মার উপর অধিক অত্যাচারী, যে সালাত আদায় করার জন্য ভালোভাবে ওজু করে নি, সময়মত সালাত আদায় করে নি এবং সালাতের ফরয-ওয়াজিবগুলো ঠিক মত আদায় করে নি।

দুই- ঐ ব্যক্তি, যে সালাত সময়মত আদায় করেছে, সালাতের ফরয-ওয়াজিবগুলো ঠিক মত আদায় করেছে এবং সুন্দরভাবে ওজুও করেছে, কিন্তু সে তার অন্তরের চেষ্টাকে শয়তানের কু-মন্ত্রণায় পড়ে নষ্ট করে ফেলছে। ফলে সে ওয়াস-ওয়াসা ও চিন্তা-ফিকিরের সাথে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে।

তিন- ঐ ব্যক্তি, যে সালাতের রুকন ও ফরয-ওয়াজিব সমূহের হেফাজত করেছে এবং শয়তানে কু-মন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তাকে প্রতিহত করতে সংগ্রাম করছে। **সে সর্বদা সালাতের মধ্যে তার দুশমন শয়তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত**, যাতে শয়তান তার সালাতের কোন অংশ ছিনিয়ে নিতে না পারে। এ লোকটি সালাত ও জিহাদ উভয় কাজে নিয়োজিত।

চার- ঐ ব্যক্তি, সে যখন সালাতে দাড়ায়, তখন সে সালাতের হক আদায় করে, আরকান-আহকাম ও ফরয-ওয়াজিবসমূহ আদায় করে এবং তার অন্তর সর্বদা সালাতের হক আদায় ও ফরয ওয়াজিবসমূহ আদায়ে ব্যস্ত থাকে, যাতে কোনো কিছু ছুটে না যায় এবং নষ্ট না হয়, বরং তার চিন্তা চেতনা তার

সাধ্য অনুযায়ী সবসময় সালাত কায়েম করা, সালাতকে পরিপূর্ণ করা এবং সুন্দর করাতে ব্যয় হয়। মোটকথা, আল্লাহর ইবাদত করা ও সালাতের গুরুত্ব তাকে সালাতের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে।

পাঁচ- ঐ ব্যক্তি, যে যখন সালাতে দাড়ায়, তখন সে অনুরূপই (পূর্বে বর্ণিত রূপেই) দাঁড়ায়। কিন্তু এ ছাড়াও তার অন্তরের অবস্থা ও আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীনের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার অবস্থা এমন হয়, যেন সে তার অন্তর দিয়ে আল্লাহকে দেখছে এবং সে আল্লাহর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আছে। আল্লাহর মহব্বত ও তার মহত্বে লোকটির অন্তর যেন একেবারেই পরিপূর্ণ। তার মনে উদ্রেক হয়, আল্লাহ যেন তাকে দেখছেন, আল্লাহ তাকে প্রত্যক্ষ করছেন। যাবতীয় ওয়াস-ওয়াসা ও বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কা সবই ধুলায় মিশে গেছে। এখন তার মনের মাঝে কেবল আল্লাহর মহব্বত ও বড়ত্ব ছাড়া কোনো কিছুই স্থান পাচ্ছে না। তার ও তার রবের মাঝে আর কোনো পর্দা বা দূরত্ব রইল না, সব কিছু দূর হয়ে গেছে। এ লোকের মধ্যে ও সাধারণ সালাত আদায়কারীর মধ্যে আসমান ও যমিনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তার চেয়েও অধিক ব্যবধান রয়েছে। এ লোক তার স্বীয় সালাতে তার প্রভুর সাথে ব্যস্ত, আল্লাহর দর্শনে তার চক্ষুদ্বয় সিক্ত।

প্রথম শ্রেণীর সালাত আদায়কারী, শাস্তি পাবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সালাত আদায়কারী, জিজ্ঞেসিত হবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর

সালাত আদায়কারীর গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে। চতুর্থ শ্রেণীর সালাত আদায়কারীকে সাওয়াব দেয়া হবে, আর পঞ্চম শ্রেণীর সালাত আদায়কারী আল্লাহর কাছের লোক। কারণ, তার জন্য সালাতের চক্ষুর সিক্ততার একটি অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। দুনিয়াতে সালাতের কারণে যার চক্ষুদ্বয় সিক্ত হবে, আখেরাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, সে ধন্য হবে। দুনিয়াতেও সেটার (আল্লাহর নৈকট্যের) মাধ্যমে তার চক্ষুদ্বয় সিক্ত হবে। আর আল্লাহর সাথে যার চক্ষু শীতল হবে, তার সব চক্ষু প্রশান্ত হবে। আর আল্লাহর সাথে যার চোখ সিক্ত হতে পারল না, তার জীবন দুনিয়াতে বিষণ্ন হয়ে পড়বে এবং তার না পাওয়ার যন্ত্রণায় সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।”[1]

অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের সালাতে খুশু অবলম্বন কারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যে ব্যক্তি এ পুস্তিকা তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছে, আল্লাহ যেন তাকে উত্তম বিনিময় দেন এবং এ পুস্তিকাটি যারা পড়েন, তাদের উপকার পৌঁছান। আমীন, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বুল আলামীন। সকল হামদ তথা প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই।

---

[1] আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যেব, পৃ. ৪০।